ই কার্ত্তিক ১৩২৭] (চতুর্দ্দশ সংখ্যা) [দ্বিতীয় বর্ষ।

শ্রীসরসীবালা বসু।

এক টাকা সংস্করণ।

প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

'কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির'
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮।২ কাশী ঘোষের লেন, কলিকাতা।
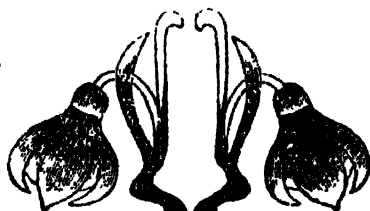
দেখুন,—সাহিত্য-গগনের কোন্ কোন্ উজ্জ্বল নক্ষত্র
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের কীর্ত্তিধ্বজা আলোকিতকরিতেছেন :—

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।
শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী।
শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।
শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।
" নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম-এ।
" নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।
" হেমেন্দ্রকুমার রায়।
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।
" বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল।
" ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
" গিরিজাকুমার বসু।
" নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" ব্রজমোহন দাস।
" প্রফুল্লচন্দ্র বসু।
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
" শরৎচন্দ্র পাল (পরিচালক)

প্রতি মাসের ১লা তারিখে সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক-লেখিকাদের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস—আপনাদের হাতে দিতে পারিব।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
১৩৪০ সাল

স্বত্বাধিকারী—
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

প্রতিষ্ঠা।

—০০—

প্রথম খণ্ড

১

সমস্ত দিনের পর শ্রান্ত-ক্লান্ত বিজয়কুমার [illegible] এক পেটি কাদা লইয়া গৃহের আঙিনায় পদার্পণ মাত্র সাত বছরের বালক সতীশ ছুটিয়া আসিয়া পিতার হাত ধরিয়া কহিল, “বাবা, আমার জন্যে কাল, সেই টিনের ঘোড়ার গাড়ী কিনে দিতেই হবে, আমার পুরোণো পড়া জলের মতন মুখস্থ হয়েছে, তুমি ধর্‌বে চল।” দশ বছরের মেয়ে পুঁটি আসিয়া কহিল, “আর আমার জন্যে বুঝি সেই চোখ বোজা পুতুল কিনে দেবে না?—দেবে না বাবা? অ মা, বাবা এসেছে! হ্যাঁ বাবা! তুমি ভাত খেতে বাড়ী আসনি কেন? মা তোমায় কত বক্‌ছিল—”

বিজয় কহিলেন, “তোদেরও পোড়া কপাল, আর আমারও অদৃষ্ট।” পুঁটি ও খোকা পিতার এ মন্তব্যের অর্থ না বুঝিলেও সন্তুষ্ট হইল না, তবে এইটুকু বুঝিল—পিতার মেজাজ সুস্থ নাই।

গৃহিণী রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই কহিলেন,

"ওমা একি ছিরি! কাদা মেখে যে ভূত সেজেছ! সারা দিন ছিলে কোথা? এই আসি বলে সেই যে বেরুলে, আর মানুষের খোঁজ-খবর নেই। পুঁটি, জল দে, হাত পা ধুক্—কাপড় ছেড়ে ফেলুক। ভাত খাওয়া হয়েছে; না তাও হয় নি!"

"আমার চারিদিকে বাপ, খুড়ো, মেসো পিসে সবাই আছে কি না, তাই ভাত খেয়ে দিব্যি মনের সুখে বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী আস্‌ছি।"

কথার ঝাঁজ শুনিয়া গৃহিণী আর কোনো জবাব দিলেন না বিজয় হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িলেন।

সতীশ কহিল, "এইবার তুমি ভাত খাও বাবা, পুঁটি তুই বাবার আসন পাত্, আমি মাকে ভাত বাড়তে বলি।" পুঁটি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসন পাতিল, ভাত আসিল, বিজয় আহারে বসিয়া কহিলেন, "ছেলেদেরও ভাত আন, আমার সঙ্গে খাক্।" ভাত খাইতে খাইতে সতীশ কহিল, "বাবা! আজ মাছ বেচ্‌তে এসেছিল মা কিন্‌লে না, কেবল আমড়ার টক, আর পোস্তর তরকারী রেঁধেছে, ওবেলা আমায় বল্লে, গাছ থেকে পেপে পেড়ে দিতে, তারই তরকারী আর ডাল রেঁধেছিল! এত বল্‌লুম, মাছ কেনো, তা কিন্‌তে পার্‌লে না—"

পুঁটি কহিল, "বা—রে! মাকে কি বাবা আজ পয়সা দিয়ে গেছ্‌ল? মা কিন্‌বে কি দিয়ে?"

সতীশ আবার কহিল, "তুমি যখন কোথাও যাও, মাকে পয়সা দিয়ে যাও না কেন বাবা? ছানা বেচ্‌তে এল, তাও মা ফিরিয়ে দিলে। প্রফুল্ল দাদা আর পূর্ণেন্দু দাদারা রোজ রোজ কত মাছ, কত ছানা কেনে। মা কেবল সবাইকে ফিরিয়ে দেয়।"

বিজয় গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "যাদের যেমন কপাল। তোদের কপালে যা জোটে, তাই তোরা খাবি না তো কি করবি?" সতীশ এ নিগূঢ় কথার মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া কহিল, "কেন বাবা, তুমি কিনবে, আর আমরা খাব।" অতি সহজ সরল মীমাংসা! পিতা-মাতার ক্ষমতা ও দায়ীত্বের প্রতি শিশুর কি প্রাণপূর্ণ আস্থা ও গভীর বিশ্বাস। বিজয় কোনো উত্তর দিলেন না, নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র। গৃহিণী সারদা কহিলেন, "মাছ কি রোজই খেতে হয় রে? প্রায়-ই তো খাচ্ছিস্ বাবা! বিজয় উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া স্থির হইয়া বসিলেন; পুঁটি পান আনিয়া দিল, পান মুখে দিয়া টিকা ধরাইয়া, তামাকু সাজিতে সাজিতে বিজয় কহিলেন, "আজ দু-দুবার রাস্তা ভুলে অন্য পথে গিয়ে সারাদিনের মত এই নাকাল ভোগ, পথে সে যে বৃষ্টি, কাঁচা-রাস্তায় এক হাঁটু কাদা, তার ওপর একবার সাপের মুখ থেকেও বেঁচে গেছি, কালী-গোখ্‌রো, ফণা তুলে তাড়া করে এসেছিল।"

সারদা শিহরিয়া উঠিয়া মা মনসার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, ছেলে মেয়ে দুটি সাগ্রহে সাপের গল্প শুনিবার জন্য পিতাকে পাইয়া বসিল। সারদা সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, "কালই মায়ের নামে শ-পাঁচ আনা পয়সার পূজো দোবো, ভাগ্যিস্ ভালয় ভালয় প্রাণে বেঁচে গেছ! এখুনি হরির লুট দিতে হবে,—পাঁচটা পয়সা হবে গা?"

বিজয় রাগিয়া কহিলেন, "পাঁচ পয়সা ট্যাঁকে থাকলে সকালে ছেলে দুটোর নুন-ভাতের জোগাড় হবে, তা নয় তোমার হরির লুট দেবার সখ চাপল। হরিকে ভোগ দেবার অনেক লোক আছে. আমি গরীব নিজে খেতে পাইনে, তা আবার তোমার

হরিকে ফাগ দিতে যাব। রাস্তাটা ভুলে অন্য এক বে-খাপ্পা পথে গিয়ে ভারী ভাবনা হোলো, ভক্তি কোরে একট গান ও গাইলুম,—

পথ ভুলালে, কোথা আনিলে,
কি দোষ দেখিয়ে বিমুখ হইয়ে
অভাগা পথিকে এ ছলে ছলিলে।
যেথা যেতে চাই, পথ নাহি পাই,
এনেছ বিপথে, ফিরিব কি মতে,
তুমি আগু হয়ে পথ না দেখালে!

তোমার হরি তখন আগু হয়ে এমন এক সাপ পাঠিয়ে দিলে, যে বাপ্ বাপ্ কোরে ছুটতে ছুটতে আর একটা উল্টো রাস্তায় গিয়ে— সে কি নাকাল! কপাল জোর ছিল, তাই প্রাণে প্রাণে বেঁচে বর্তে ফিরে এসেছি। কি বল্ খোকা?"—

সতীশ আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল, সারদা জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ছিঃ ও কথা কি বল্‌তে আছে? ঠাকুর দেবতার নাম ক'রে উপহাস করতে নেই, কোপে পড়্‌তে হয়। তিনিই দয়া করে প্রাণে রক্ষা করেছেন।"

"বড় পৌরুষ দেখিয়েছেন। তার যা মুরোদ্ তা আমার বোঝা আছে। বাজে পয়সা নষ্ট করবার ক্ষমতা আমার নেই, যা খোকা, তোর বই নিয়ে আয়, কেমন পুরোণো পড়া করেছিস্ দেখি—"

খোকা ছুটিয়া গিয়া নিজের বইখানি লইয়া আসিল, বিজয় তামাকু খাইতে খাইতে পুত্রের পাঠ লইতে লাগিলেন।

২

রজনীর বাড়ীতে সান্ধ্য-সভায় বিজয় আসিয়া পৌঁছিবামাত্র, যামিনী বলিয়া উঠিলেন, "Hallo man, are you living still? We counted you among the deads. Where had you been so long?"

বিজয় বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আর দাদা, ম'লেই তো বাঁচতুম, তা যখন মরিনি, তখন পনের দিন পরে একবার তোমাদের দেখাটা দিতে এলুম।"

পরেশ কহিলেন, "আর ম'রেও যদি ভৌতিক দেহে দেখা দিতে আসতে, তা হ'লেও আমরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হ'তাম না। আজকের সভায় আমরা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা ক'রছি যে, যে আগে ম'রবে, সে এসে আর সবাইকে দেখা দিয়ে যাবে।"

যামিনী কহিলেন, "আর পরজগতের হিসেব-নিকেশ্‌টাও বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেবে।"

বিজয় কহিলেন, "সব ফাঁকী ভায়া—সব ফাঁকা। একটা অর্থশূন্য জুয়াচুরী ছাড়া ইহ-পরকালের ব্যাপারটা আর কিছুই না। এখন বাজে কথা থাক্, ঘরে চাল নেই, রাত পোহালে রান্না চড়বে না, সেই যোগাড়ে বেরিয়েছি, দু-টাকা হাওলাত দিতে পার তো একটু ব'সে যাই, নইলে অন্যত্র যোগাড় দেখিগে।"

বিজয় সভায় বসিলে, কথাবার্ত্তা জমে ভাল, তাহাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিতে কাহারও মন সরিতেছে না, অথচ স্পষ্ট ভাষায় সে এমন জিনিষ চাহিয়া বসিয়াছে, যাহা দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, যেহেতু বিজয়ের হাত-পাতা অভ্যাসটা যখন তখন থাকিলেও,

উপুড় হস্ত করিতে সে একেবারেই নারাজ। যামিনী কিন্তু বীরের কাজ করিলেন—পকেট হইতে দু'টি টাকা বাহির করিয়া কহিলেন, "এই নাও টাকা, আজই মাইনে পেয়েছি, টাকা দুটো কাপড়ের দোকানের ধার শোধ দেবার জন্যে ছিল, তাই এখন নিয়ে যাও। তারপর বলছি কি, না হয় একটা চাকরী বাকরীই কর, পেটে বিদ্যেও আছে, মাস গেলে তিরিশ-চল্লিশ টাকা আন্‌তে পারলেও তো স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন হবে, তা নয় কি মাথামুণ্ডু যে ক'রে বেড়াচ্ছ, কিছু বুঝি না। কয়লার ব্যবসায় বুঝি কিছু হ'লো না?"

বিজয় টাকা দু'টি পকেটে রাখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন,—কহিলেন, "আর ভাই, সবই আমার অদৃষ্ট; শিবু আর আমি দু'জনে একই দিনে একই ব্যবসা আরম্ভ করলুম, সে বেশ পসার করে ফেলেছে, আর আমার বরাতে কিছুই হ'লো না। প্রথম প্রথম সহরের বড় বড় খদ্দের সব আমারই একচেটে হ'লো। কয়লার দর চ'ড়বে শুনে, কেউ দশমণ, কেউ বিশমণ, কেউ পাঁচশ মণ, কিনে রাখ্‌তে লাগ্‌ল, হুহু ক'রে আমার মাল কেটে গেল, সব কয়লা ফুরিয়ে গেল, আবার চালান আন্‌তে হবে, হাতে কিন্তু টাকা নেই, পাঁচ টাকা দিয়ে কেউ কুড়ি টাকার জিনিষ নিয়েছে, কেউ দু-টাকা দিয়ে দশটাকার কয়লা কিনেছে, টাকা দুয়োরে দুয়োরে আদায় ক'র্‌তে গেলুম, তখন সবার-ই হাত গুটুনো। বলে 'মাইনে না পেলে কি ক'রে দোবো?' সোজা হাঁকিয়ে দেয়, কাজেই আর কয়লা আনাতে পারলুম না, গুদাম বন্ধ। আমারও তেমন পুঁজি নেই যে, পাঁচশ টাকা ধারে পড়ে থাকুল—আর পাঁচশ টাকার চালান আনি। শিবু কিন্তু ধারে ছাড়েনি, রয়ে সয়ে নগদ বিক্রী করেছে, আমি বেটা ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছি।"

পরেশ কহিলেন, "তুমি যেমন stupid, ধারে কি নতুন ব্যবসা চলে ? যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল। ইঁটের কারবারেও এই রকম ক'রে ফেল্‌ মেরেছিলে, যখন কয়লার ব্যবসা ক'রতে চাইলে, তখুনই তোমায় পই পই ক'রে বারণ ক'রে দেওয়া গেল, যেন ধারে কাউকে বেচো না, তাতো শুন্‌লে না ! দেখ, রাতারাতি বড় মানুষ হবার আশা ছাড়, একটা চাকরী-বাকরী দেখে শুনে লেগে পড়, নইলে সংসার চালাবে কি ক'রে ?"

বিজয় কহিলেন, "চাকরী আর বুড়ো বয়সে ক'রতে পারব ? ছেলেবেলায় সব এক স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি, তোমরা চাকরী-বাকরী ক'রছ. এক রকম গুছিয়ে নিয়েছ—আমার কপালে শনির দৃষ্টি। এক যদি প্রথম থেকে চাকরী নিতে পারতুম, সে হ'তো। চিরটা-কাল ছুটোছুটি ক'রে এখন কি আর বাঁধা নিয়মে খেয়ে চাকরীতে হাজির হ'তে পারি ? ও তোমার সাহেবের হুকুমে ওঠা বসা, কথায় কথায় কাজ কর্ম্মের কৈফিয়ৎ দেওয়া, আর apology চাওয়া আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

সনৎকুমার এতক্ষণ একটিও কথা কহেন নাই। বিজয়ের চাল চলনকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। সেজন্য বিজয়কে এতদিনের পর দেখিয়াও তিনি বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন নাই। যে বইখানি তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিতেছিলেন, সেখানি গীতা।

অবশ্য বিজয়ের কথাবার্ত্তাগুলা সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, এইবার বই বন্ধ করিয়া তিনি কথা কহিলেন, "তোমার দ্বারা চাকরী-বাকরী হবে কেন ? হবে কেবল আড্ডা দেওয়া, আর অভাব হলেই লোকের কাছে হাত-পাতা।" অন্য কেহ এ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে লজ্জিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজয় সে ধাতুর লোক

নহেন। তিনি যথেষ্ট সপ্রতিভ ভাবেই কহিলেন, "সেটাও যে আমার ভাগ্য-দেবতার মর্জ্জি, তিনি আমার ললাট-পটে যে ছাপ মেরেছেন, তা ওল্টাবার সাধ্য কি আমার? এবারে তো বনের দিকে যে জমিটা খাজনা বিলি ক'রে নিয়েছিলাম, সেটাতে তরমুজের চাষ করেছি। সবাই বলেছিল—এদেশের মাটিতে ও জিনিষ কিছুতে ভাল ফল্‌বে না, কিন্তু কি সুন্দর তরমুজ-ই না ফলেছে, যেমন-ই বড় আর তেমন-ই মিষ্ট। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর উত্তপ্ত দিবসের সন্ধ্যায় এ হেন জিনিষের গুণ বর্ণনায়, কোন্ তৃষ্ণার্ত্ত রসনার সংযমের বাঁধ না ভাঙ্গিয়া থাকিতে পারে?"

যামিনী কহিলেন, "তা নমুনাটা একদিন দেখ্‌তে দাও, শুধু কাণে শুনে আর কি হবে?"

পরেশ কহিলেন, "না দাদা, শুধু দেখেই বা কি হবে। এ ক্ষেত্রে কেবল চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলেই তা চল্‌বে না, জিহ্বা এ ক্ষেত্রে প্রধান বিবাদকারী, তার সঙ্গেই আগে মিট্‌মাট্ করতে হবে।" সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন, বিজয় তখনই রজনীর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "যা তো ভীমে, আমার বাড়ী গিয়ে একটা খুব বড় দেখে তরমুজ নিয়ে আয় তো!"

ভীম চলিয়া গেল, যামিনী কহিলেন, "বিক্রী কর্‌বার জন্যে চাষ করেছ, না শুধু বিলুচ্ছ? বিলিয়ে তো পেট ভর্‌বে না!"

বিজয় কহিলেন, "না, বেচ্‌তে হবে বই কি? চাষে বেশ খরচ হয়েছে, তবে ফসল যে রকম হয়েছে, তাতে বিক্রী হোলে লাভে দাঁড়াবে, তবে আজ তো দশটা বিলুতে হয়েছে; সবে প্রথম এক গাড়ী এনেছি কি না, এক গিন্নীই—ঠাকুর বাড়ী, কালী বাড়ী

হরিসভা, পুরুৎ বাড়ী, বামুন বাড়ী কোরে সাতটা বিলিয়েছেন, কি করি, রদ্ কর্‌বার উপায় কৈ ?"

যামিনী কহিলেন, "অমনি ক'রেই বিলুতে থাক, বিক্রী বুঝি একটাও হয় নি ? ও তরমুজের তো দশ আনা জোড়া দাম লোকে দেবেই।"

"বেচেছি বই কি—পনেরটা বিক্রী হয়েছে। লোকে লুফে নিচ্ছে।'

"নগদে বেচেছ, না ধারে ?"

"হাঁ—তা—নগদ বই কি। দশটার দাম হাতে হাতে পাইনি বটে, কাল সকালেই আদায় হয়ে যাবে।"

"তোমার মাথা আর মুণ্ড। এত ঠেকেও শিখতে পারছ না।"

পরেশ কহিলেন, "পেটের ভাত জোটে না, অথচ নবাবী চাল তোমার গেল না ; দাতাকর্ণ আর কি ?" বিজয় কহিলেন "নবাবী চাল কিসে দেখ্‌ছ ভাই, তোমাদের মতন সাট-কোটও নেই, বার্ণিশ করা জুতোও নেই, লম্বা কোঁচাও নেই। একটা ছাতা—তাও তালি লাগানো, জামার গলার বোতাম যে কোথায় উধাও হয়েছে তার পাত্তা নেই, পায়ের চটি জোড়া, চাতক পাখীর মতন জল তৃষ্ণায় হাঁ করেই আছে, এ গুলো যে নবাবীর চিহ্ন তা আমার জানা ছিল না।"

পরেশ কহিলেন, "বেশ—বেশ, তাই দান ধ্যানই কর, পুণ্য সঞ্চয়ও হবে, চারদিকে খ্যাতিও বেরুবে, লোকেও তোমার জয়-জয়কার কর্‌বে।"

বিজয় কহিলেন, "কেন টিট্‌কিরী দাও দাদা, সবাই যে আমায় জোচ্চোর বোলে গাল মন্দ দেয়, তাও আমি জানি। লোকের গাল মন্দ বা প্রশংসা লাভটাও বরাতের জোর। ঐ দেখ না, যুধিষ্টির মণ্ডল, খুদিরাম সরকার, তেজারতি আর পাটের ব্যবসায় ক'রে

বড় লোক্ হ'য়ে গেছে, টাকার গাদায় বসে আছে, কিন্তু তবু হাত দিয়ে জলটুকু পর্য্যন্ত গলে না, বাড়ীতে ভিখিরী গেলে হাঁকিয়ে দেয়, অথচ দুর্ভিক্ষ হ'লে পঁচিশ টাকা দান করেছে, আরও কিসে কিসে দান্ করেছে, কাগজে নাম বেরিয়ে গেছে, আবার বিশেষণ দিয়েছে দেখেছ ; "দানশীল, বদান্য",—ইত্যাদি, অথচ গাঁয়ের লোক তো বাসীমুখে প্রাণান্তে নাম নেয় না ; কিন্তু দেশের লোকে জান্ছে একজন মহাদাতা।"......এই সময় ভীম একটি বৃহৎ তরমুজ লইয়া ফিরিয়া আসিল। বাবুরা কথাবার্ত্তা রাখিয়া সে দিকে মন দিলেন।

৩

বিজয়ের আদেশে ভীম বাড়ীর ভিতর হইতে একটি বড় ছুরি লইয়া আসিল, পরেশ আস্তিন গুটাইয়া, সোৎসাহে তরমুজের উপর ছুরি চালাইয়া, হাঁসাইয়া ফেলিলেন, কি সুন্দর টক্‌টকে লাল! যামিনী সানন্দে কহিলেন, "বাঃ—বাঃ, মিচরির সরু-দানার মতন যে, ভারী সুন্দর তরমুজ তো, তোমার হাতের গুণ আছে বটে।"

বিজয় কহিলেন, "আহা-হা, খোলা যেমন কালো, ভেতরে তেমনি রাঙা। কাল পাঁঠার বুকের কল্‌জের মতন টুক্‌টুকে, কি বল ?"

সনৎ রাগিয়া কহিলেন, "তোমার উপমার মুখে আগুন, কি জিনিষের সঙ্গে কিসের তুলনা, এমন না হ'লে, অমন বুদ্ধি! রজনী মাছ পর্য্যন্ত খায় না, সে কি তা হ'লে তোমার তরমুজ মুখে দেবে ?"

যামিনী কহিলেন, "গুরুদেবও নিরামিষ ভোজী, তিনি রোজই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিন্তু এমন বেয়াদব্ যে একবার এসে প্রণামটি করে যাও নি।"

বিজয় কহিলেন, "ঐ যে উনি আস্‌ছেন।" রজনীর সহিত গুরুদেব একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন, গুরুদেবের বেশ শান্ত সৌম্য মুর্ত্তি, পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হইবে, হাতের লাঠিটি একটি কোণে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া বসিবামাত্র বিজয় পদধূলি লইল; তিনি সস্নেহে বিজয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "কেমন আছ, বিজয়! আমি আজ তিন দিন হোলো এসেছি, তোমার কথা জিজ্ঞেস করি, এরা বলে, তুমি অনেকদিন আসনি। খবর কি, বাড়ীর সব ভাল তো?"

বিজয় কহিলেন "ভাল বই কি, নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকায় এসে উঠ্‌তে পারিনি।"

রজনী কহিলেন, "তুমি একেবারে ডুমুর ফুলই হয়েছ। তা এখন করছ কি? তরমুজের চাষ করছ তা তো শুনেছি। এই বুঝি সেই তরমুজ? খুব বড় জাতের হয়েছে তো?"

বিজয় সানন্দে কহিলেন, "তোমাদের আশীর্ব্বাদ, আর আমার হাতযশ। গুরুদেব অনুগ্রহ করে প্রসাদ করে দিন ত, সবাই প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হোক্।"

শিষ্যবৃন্দের অনুরোধে গুরুদেব এক টুকরা তরমুজ মুখে দিলেন, অতঃপর সকলেই তৃপ্তির সহিত খাইয়া বাহবা দিতে লাগিলেন, বিজয় কহিলেন, "আচ্ছা, এ'বারে এলে সবার বাড়ীতে একটা ক'রে পাঠিয়ে দেবো। ভাল জিনিষ বাড়ীর ছেলেপুলে না খেলে আর তৃপ্তি হয়?"

যামিনী কহিলেন, "মায়া এমনি জিনিষ, নিজে ভাল কিছু পেলেই স্নেহাস্পদদের তার ভাগ দেবার ইচ্ছা হয়।" রজনী কহিলেন, "মানব-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি, স্নেহের ধর্ম্মই তাই।"

সনৎ নির্ব্বিকার পুরুষের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ঐ

মায়ারই নাম কিন্তু অ-বিদ্যা, পুরুষের সকল প্রকার মোহের মূল কারণই ঐ মায়া।"

বিজয় কহিলেন, "সে জন্যে তোমার আমার বিশেষ দোষ নেই সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায় যাহা সৃষ্ট হয়েছে, সেটাকে তো তাঁর সৃষ্টির ভুল বল্‌তে পার না।"

সনৎ কহিলেন, "কিন্তু পুরুষের উচিত নয়—তার বশ হওয়া। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—নিজের মনকে সকল প্রকার মায়া-মোহ হতে পৃথক রাখ্‌বে, অন্ততঃ চেষ্টা তো কর্‌বে।"

বিজয় কহিলেন, "আমার মনে হয়, সে চেষ্টার বড় বেশী দাম নেই। ভগবান বা নিয়তি যার অদৃষ্টে যে চেষ্টার সাফল্য লিখেছেন, তার সে চেষ্টা সফল হবেই। নতুবা উহার বিপরীতে নিষ্ফলতাই আস্‌বে।"

সনৎ রাগিয়া কহিলেন, "তুমি যে ঘোরতর অদৃষ্টবাদী, পুরুষ-কারকে তা হোলে অস্বীকার কর্‌ছ?

বিজয় ধীরভাবে কহিলেন, "না কোরে করি কি? তবে একেবারেই কর্‌ছি না, কাজ আমায় কর্‌তেই হবে, কাজ না করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম নয়, তবে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যার অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। সেই শ্লোকটির কথা মনে কর না,—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী,
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবান্ নিহত্যঃ কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা,
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কুত্র দোষঃ?"

সনৎ কহিলেন, "ওতেই তো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, পুরুষ উদ্যমশীল না হোলে জয়শ্রী তার গলায় বরমাল্য দেবে কেন?"

বিজয় কহিলেন, "আবার ওর শেষ দু'ছত্রেও তো, একথা বল্‌ছে যে উদ্যোগ ক'রেও যদি যত্নের মত ফল না পাও, তখন সেই অদৃষ্টের দোহাই ভিন্ন আর গতি নেই। তার মানে, তোমার চিরন্তন অভ্যাস ও সংস্কারে বা স্বাভাবিক ধর্ম্মে নিয়মিত কাজ যা বারবার তুমি করে যাও, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, সেগুলা পরে পরে ঘ'টে যাবেই। এখন তর্কের জোরে উঁচু গলায় যদিও এ কথাকে তোমরা অস্বীকার ক'রে যাও, তা হ'লেও কিন্তু—জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সংসার যাত্রার পথে বারে বারে একথা মেনে চল্‌তেই হবে, না মেনে কিছুতেই পারবে না।"

বিজয়ের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় অসহিষ্ণু হইয়া যামিনী কহিলেন, "তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মতন কথা বল্‌ছ বিজয়। তুমি তাহ'লে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে চাও? তাঁর অনন্ত প্রেম, অনন্ত করুণা যা প্রতিনিয়ত কোটী কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডতে প্লাবিত করে দিচ্ছে, সে সমস্তই মদগর্ব্বে অন্ধ হয়ে অস্বীকার করছ? অন্ধের কাছে যেমন আলোকের অস্তিত্ব নেই, তেমনি তোমারও কাছে সেই মহান্ পরমেশ্বরের অপার করুণার অস্তিত্ব বোধ নেই।"

সনৎ সোৎসাহে টেবিল চাপড়াইয়া কহিলেন, "বেশ বলেছ যামিনী, কি ভয়ানক ধৃষ্টতা, কি চূড়ান্ত মূর্খতা।"

বিজয় কহিলেন, "তা আমার যত দোষই দাও, আমি তোমাদের ভগবানের কোনো কিছু তো অস্বীকার করছি না, তাঁকে নিষ্ঠুর, বা প্রেমময় বলা নিয়েও আমি তর্ক করছি না—"

সনৎ বাধা দিয়া কহিলেন, "তবে তাকে কোন্ বিশেষণটা

দিচ্ছ শুনি? সগুণ না নির্গুণ? ক্রিয়াশীল না নিষ্ক্রিয়? উপনিষদ্, বেদান্ত, সাংখ্য প্রত্যেকটাতে তাঁকে যে—"

বিজয় হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোড় হাত করিয়া কহিলেন, "দোহাই তোমাদের, অতো পাণ্ডিত্য আমার নেই, দর্শন, বিজ্ঞান, উপনিষদ্ খুলে বোসো না, সহজ জ্ঞান, সহজ বুদ্ধি নিয়ে চ'লে এসো. ধার করা বিদ্যা-বুদ্ধি টেনে টুনে এনে হাজির কোরো না, যা প্রতিদিনকার জীবনে প্রত্যক্ষ করছি, উপলব্ধি করছি, তাই থেকে সিদ্ধান্ত করা চাই।"

পরেশ কহিলেন, "তোমার বল্‌বার উদ্দেশ্য কি?"

বিজয় কহিলেন, "আমি শুধু এই বল্‌ছি, যে অদৃষ্টই মানব-জীবনের নিয়ামক। যদি বল অদৃষ্ট কি? তার রহস্য "অ—দৃষ্ট" ঐ নামেতেই নিহিত। সুতরাং সেটা যাই হোক্, মানুষের প্রাক্তন কিন্তু ওরই নিয়মে বাঁধা। ভগবান আছেন, এ আমি খুব শ্রদ্ধা-বুদ্ধির সহিত মান্‌তে চাই, তাঁর অনন্ত বিভূতি, তিনি অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, শক্তিমান তিনি, কিন্তু সেই অনন্ত অপার শক্তি তিনি স্বেচ্ছায়, নিজেরই গড়া নিয়মের শিকলে বেঁধে ফেলেছেন, এবং সেই নিয়মের বন্ধনে নিজেও বাঁধা পড়েছেন। আচ্ছা, বল দেখি, রাজা নিয়ম প্রণালী তৈরি করেছেন, আইন-কানুন গড়েছেন, রাজ্য সুসাশনে থাক্‌বে জেনে, কিন্তু আর সকলকে সেই নিয়ম-কানুন মান্‌তে বলে, নিজে, যদি তিনি সেটাকে প্রতিপদে লঙ্ঘন ক'রে চলেন, তা হ'লে সে কি রাজোচিত কাজ হয়?"

পরেশ কহিলেন, "তা কথনও সুবিবেচক রাজা করেন না, তবে আবশ্যক হ'লে নিয়ম প্রণালী পরিবর্ত্তন কর্‌তে হয় বৈকি,

আর যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর তাঁর ক্ষমতার তো আমরা কল্পনাই করতে পারি না।"

বিজয় কহিলেন, "আচ্ছা এখন আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি,—ভূতনাথ অতি শান্ত ব্যক্তি, বড় বিনয়ী, পরোপকারী, সাধুস্বভাব, দেবসেবারত। হঠাৎ তার যুবা পুত্রটি মারা গেল কেন? কোন্ পাপে তার এ ভয়ানক মনস্তাপ?"

পরেশ উত্তর দিলেন, "সেটা অবশ্য তার নিয়তি।"

বিজয় কহিলেন, "তবেই তো, পথে এস দাদা, নিয়তিকে না মেনে তো পারলে না, নিয়তিকে না মানলে কষ্টে, দুঃখে সান্ত্বনা পাবার কোনো উপায় নেই। ঐ যে কত লোকের বছরান্তে খেয়ে প'রেও রাশি রাশি ধন সঞ্চয় হচ্ছে, কত ঘরে আবার অর্থের প্রাচুর্য্য থাকলেও একটি সন্তান অভাবে ভোগ করবার জন্যে ভবিষ্যতে কেউ থাকছে না। আবার দেখ, কত ঘরে নিরন্ন দরিদ্র পরিবারে এক পাল ছেলে-মেয়ে পেট ভ'রে খেতেও পাচ্ছে না; চারিদিকে অবস্থার এ বৈষম্য দেখে কি মনে হয় না যে, ভগবান এত নিষ্ঠুর কেন? তিনি কি খেয়ালের বশে কাজ করেন, যে কেউ তাঁর কৃপাদৃষ্টির জোরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছেন, আর যে হতভাগা তাতে বঞ্চিত, তার দুর্দ্দশার সীমা নেই! তিনি যদি সবারই মা বাপ, তাহলে কাউকে রাজভোগে রেখে, কাউকে বা এক মুষ্টির জন্যে পথের কাঙাল করেছেন কেন?"

সনৎ কহিলেন, "সে তাদের স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মফল।"

বিজয় কহিলেন, "কিন্তু সে কর্ম্ম করায় কে?—

জানামি ধর্ম্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ

ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এতে তো বোঝা যাচ্ছে, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই পরিচালক, তিনিই স্রষ্টা! মানুষ করণ, পরিচালিত যন্ত্র মাত্র।"

যামিনী কহিলেন, "কি সুখ-দুঃখের কথা যে তুমি এইমাত্র বল্‌ছিলে, ওগুলা তুচ্ছ কথা, এ সংসার মায়াময়, যা আজ তুমি খুবই কষ্টের বা দুঃখের ক'থা বলে ভাবছ, সে তো অনন্ত-কাল-সমুদ্রে একটি জলবিম্বের মতন মাত্র, সুখ ও তাই, সুতরাং ঐগুলো চোখে দেখে, সুখ-দুঃখের বিচার করা অসঙ্গত।"

বিজয় কহিলেন, 'কি ক'রে অসঙ্গত? যদি সবই ফাঁকী, সবই মায়াময়-ই হয়, আজকের সুখ বা দুঃখ যদি গণনার মধ্যে না আনলেই চলে, তাহ'লে একটা দিন—একটা দিন চুলোয় যাক্,—একটা বেলাও অনাহারে থাক্‌তে চাও না কেন? এক মুহুর্ত্তের যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হয় কেন? অনন্তের রাজ্যে মানুষের একটা জীবন-ই তো এক লহমা মাত্র, তবে সেই সমস্ত জীবনটা নিয়ে এত রকমে টানা-হেঁচড়া কেন?"

সনৎ কহিলেন, "যাক্ ও কথা, একটা তর্কের জন্যে আর একটা তর্ক এসে পড়্‌ছে। তুমি যে ব'ল্‌ছিলে অদৃষ্টই প্রধান, তাহ'লে অদৃষ্ট লিখিত বিপদে যখন আমরা পড়্‌ব, দুঃখে-কষ্টে যখন অভিভূত হবো, তখন তাহ'লে আমরা সর্ব্বভয়প্রত্তো, সর্ব্বদুঃখহারী ভগবানের নাম স্মরণ কোরবো না? তিনি কি ভক্তের কাতর আহ্বান শুনে উদাসীন থাক্‌বেন মনে কর?"

বিজয় কহিলেন, "নাম নেবে না কেন? এক শ বার নেবে। কিন্তু দুঃখ কষ্ট হতে পরিত্রাণের জন্যে যদি নিতে যাও—সেটা মিথ্যা।

অদৃষ্টে যদি পরিত্রাণ থাকে, তো হবেই, না থাকে, হাজার তাঁকে ডাক দাও, তিনি শুনেও বধির হয়েই থাক্‌বেন, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কিছু হবে না।"

সনৎ রাগিয়া কহিলেন, "তুমি বড় অবিশ্বাসী, সুতরাং মহাপাপী।

বিজয় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা হবে। তোমার প্রদত্ত বিশেষণ মাথা পেতে আমি নিলুম, কিন্তু তবু আমি এই কথাই বল্‌ছি যে ভগবান—সৃষ্টির ঘড়িতে দম দিয়ে চুপ-চাপ ব'সে ব'সে দেখছেন, সে ঘড়িতে বাঁধা নিয়মে, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলেছে, তোমার আমার সহস্র প্রার্থনায়, অজস্র কাকুতি-মিনতিতেও দুটার পর একটা, বা চারটের পর দু-টা বাজ্‌বে না। দুয়ের পর তিন, চারের পর পাঁচই বেজে চ'ল্‌বে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ছিলেন পূর্ব্বে, কিন্তু বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি ক'রে তাঁর সমস্ত শক্তি, নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে।"

সনৎ অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, "কি ভয়ানক ধৃষ্টতা, তাঁরই করুণার দান, এই দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পেয়ে তুমি তাঁরই বিদ্রোহীতা করতে যাও?"

বিজয় আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তাঁর করুণার মানব-জীবন দানের জন্য কে তাঁর দুয়োরে হাত পেতে বসে ছিল? তুমি যতই গলাবাজী কর, আমি তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান ব'ল্‌তে রাজী নই!"

সনৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তাঁর বড় বয়েই গেল। তোমার মতন অকৃতজ্ঞের নাম জগতের তালিকা হতে মুছে গেলেই ভাল।" গুরুদেব ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে মুদ্রিত চক্ষে শিষ্যবৃন্দের তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া যাইতেছিলেন, তর্ক—অবশেষে কলহে পরিণত

হয় দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "চুপ কর সনৎ, তোমাদের মনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ নিয়ে যে তর্ক ক'র্‌ছ, এ ও তাঁর এক লীলা। সকলের কাছে তিনি সমান ভাবে প্রকাশ হন না, তা ছাড়া তিনি রাজ্যের অতীত-উপলব্ধির গোচর মাত্র। বিজয় একটু শান্ত হ'য়ে একটা গান কর, রজনী সেতারটা নিয়ে বোসো।"

বলা বাহুল্য, গুরুদেব আসিলে প্রত্যহ-ই এই সময় ভাবপূর্ণ ভগবৎ সঙ্গীত হইত, বিজয় তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বসিয়া মধুর উচ্চকণ্ঠে গান ধরিল।

"তোমার কর্ম্ম তুমি করাও মা,
লোকে বলে আমি করি।"

নৈশ গগন প্লাবিত করিয়া সুমধুর সু-স্বর লহরী সুধার ধারার ন্যায় মানুষের শ্রবণ ও মন মুহূর্ত্তে ভরিয়া ফেলিল, পথে চলিতে চলিতে অনেক শ্রোতাই থমকিয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ সে সঙ্গিত-রস উপভোগ করিতে লাগিল, সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের সমুদয় চিত্তবৃত্তিগুলি একমুখী হইয়া ভক্তি-সলিলে অবগাহন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য সংসার তাপ জুড়াইল, সনতের মনে বার বার প্রশ্ন হইতে লাগিল— ভগবানের প্রেমে অবিশ্বাসী লোকে কেমন করিয়া এমন ভাবপূর্ণ সঙ্গীত গাহিয়া সকলের মন মুগ্ধ করিয়া লয়?

৪

পথে চলিতে চলিতে পরেশ সনৎকে কহিল, "একটু লক্ষ্য ক'রে দেখছ হে! গুরুদেব বিজয়কে বিশেষ স্নেহ করেন। আমরা তাঁর এত অনুগত ভক্ত, সে তো স্পষ্টতই তাঁর মতের বিদ্রোহী,

আমাদের সভায়ও সে এখন কচিৎ কখনও আসে, অথচ গুরুদেব ওকে বেশ টানেন।"

সনৎ কহিল, "সে আর বল্‌তে? আজ চার-বছর যাবৎ আমরা দীক্ষা নিয়েছি, আমরা সব ঠিক মত মন্ত্র-তন্ত্র গুলো মেনেও চল্‌ছি, কিন্তু বিজয় দীক্ষাও নিলে না, পুজো আচ্চাও করে না, দিন দিন যেন কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছে, তবু গুরুদেব যে ওকে কেন এত স্নেহ করেন, সেইটা-ই একটা রহস্য, আবার রজনীরও ওর প্রতি ভারী সহানুভূতি।"

পরেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু গুরুদেবকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া বলিল, "ঐ যে গুরুদেবও এইদিকে আস্‌ছেন। উভয়ে আগু হইয়া গুরুদেবের পদধূলি লইল, সনৎ কহিল, "কোথা যাচ্ছেন?"

গুরুদেব কহিলেন, "একটু বিজয়ের বাড়ী যাচ্ছি, বৌ-মা ডেকে পাঠিয়েছেন একবার। তোমরা কোন্ দিকে যাচ্ছ?"

সনৎ কহিল, "যামিনীর বাড়ী যাচ্ছি, আফিসের একটু কাজ আছে।" "বেশ যাও" বলিয়া গুরুদেব পথ চলিতে লাগিলেন।

তখন প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। লাঙ্গল কাঁধে চাষার দল সোৎসাহে মাঠে চলিয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝা-মাঝিতেই দু-পসলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জমি তৈয়ার করিবার খুব সুবিধা হইয়াছে। রাখাল বালক গাভীর পাল তাড়াইয়া লইয়া গো-চারণে যাইতেছে, একহাতে কোচড় হইতে মুড়ি তুলিয়া খাইতেছে আর এক হাতে ছোট পাঁচনী বাড়ীর দ্বারা অবাধ্য গরু গুলাকে তাড়া করিয়া দলে ফিরাইয়া আনিতেছে। শীতের নিষ্ঠুর শিশিরকণা ও গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রকিরণ, পথ ঘাট প্রান্তরের সমস্ত তৃণ গুল্মশেষে

শুকাইয়া ফেলিয়াছিল, হঠাৎ নূতন মেঘের স্নেহধারা বর্ষণে, আজ চারিদিকে আবার সেই শুষ্ক, রসহীন ধূলা-মাটির মধ্য হইতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। রাঙা পথ খানির আশে-পাশে ফিকা-সবুজের আভায় চোখ যেন জুড়াইয়া আসিতেছে। দু-একটা নীচু জমিতে খানিকটা করিয়া বৃষ্টির জল জমিয়া আছে, উহাতে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া সোণালী ঝিনিক হানিতেছে। গ্রাম পথ হইতে মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি কাঁকালে লইয়া মাছ বেচিতে চলিয়াছে, আজ হাটের দিন, দরিদ্র গ্রামবাসীরা ঘরে শাক, ঝিঙা, শসা যা-া হইয়াছে, তাহাই বেচিয়া অন্য জিনিষ কিনিবার জন্য যাইতেছে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মাঠে ধান পুঁতিবার জন্য গামছা, কেহবা জলে ভিজিয়া মাঠে ভাত দিতে যাইবে, সেজন্য কেতানা কিনিবে, উহারই গল্প করিতে করিতে পথে চলিতেছে, কোনও মেয়ে বহুদিন হইতে এক-আধটি করিয়া পয়সা জমাইয়া ছয় আনা পয়সা করিয়াছে, সেই পয়সায় আজ পাড়ার ভুবনীর মতন গিল্টির কাঁকন ও দু-একজোড়া মাকড়ী কিনিবে, এই আনন্দে সঙ্গিনীদের অপেক্ষা দ্রুত তালে পা ফেলিতেছে, সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ কেহ শুনাইয়া রাখিতেছে, বৃষ্টিতে ভাসান হইলে, সে ও মাগুর কই ধরিয়া হাটে বেচিয়া পয়সা করিবে, তখন সে ও মাথার ফুল চিরুনী ও গলার এক ছড়া গিল্টির হার কিনিবে— সে হারের রঙ ঠিক সোণার মতন। গুরুদেব পথে চলিতে চলিতে— তাঁহার মনে অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এমনি গ্রাম, এমনি পথ, এমনি দরিদ্র, শান্ত পল্লীবাসীদিগের হাট বাজারের বেচা-কেনার সঙ্গে তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘকাল জড়িত ছিল, আজ সে কাহিনী স্বপ্ন বা ছায়াবাজীর ন্যায় মনে হইলেও একদিন তো সেগুলির

বাস্তব রূপই ছিল! আজ প্রায় বার বৎসর হইল, তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী বেশে—দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু লোকালয়ের বন্ধন তবু কাটাইতে পারিয়াছেন কই? সম্পন্ন পিতার একটিমাত্র পুত্র তিনি, কলিকাতায় কৃতিত্বের সহিত তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার মৃত্যুর পর বাধ্য হইয়া ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া জমি জমা দেখিতে-ছিলেন, পুত্রের বিবাহ দিয়াই জননীরও মৃত্যু হয়। যাহা হউক নব বধূর সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে তিনি সহজেই পিতৃ-মাতৃ শোক ভুলিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনটি পুত্র কন্যা হইল, সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, হঠাৎ কোথা হইতে প্রবল ঝড় আসিয়া সমস্ত ওলট্-পালট করিয়া দিল, জ্বর-বিকারে শিশু সন্তান তিনটিকে রাখিয়া পত্নীর মৃত্যু হইল। সাধ্বী-সতী স্বামী রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছে, সকলেই এয়োরাণী ভাগ্যিমানীর নামে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, বয়স খুব কাঁচা—মোটে কুড়ি বৎসর, তা হউক না, স্বামীর কোলে মরিয়াছে তো বটে! ছেলে তিনটির অবশ্য বড় কষ্ট হইল, তা বাবা আবার বিবাহ করিলেই মা হইবে, ভাবনা কি? গুরুদেব'ও অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন, কিন্তু সহানুভূতি ও সমবেদনার অজস্র বর্ষণে সেটা অনুভব করিতে সময় পাইলেন না। কুমারী কন্যার পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকের দল অতি মাত্রায় এই গৃহ-শূন্য শোকার্ত্তের প্রতি মমতা পরায়ণ হইয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের জন্য পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিলেন, শোকের প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে গুরুদেবও সে প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না, কিন্তু আবার সব বিপর্য্যয় হইয়া গেল, কলেরা হইয়া হঠাৎ বড় সন্তানটি মারা পড়িল, ছোট দুইটিকে

লইয়া মহা বিপদ ; যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে পত্নী-হীন হতভাগ্যের প্রতি নিতান্ত স্নেহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এ বিপদের সময়ে তাঁহাদের আর বড় উদ্দেশ পাওয়া গেল না, কাল রোগে অন্য শিশু দু'টিও আক্রান্ত হইয়া তিন দিনের দিন এক সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এ আঘাত যে কি মর্ম্মপ্রদ তাহা কল্পনা করাও কষ্টকর, গুরুদেব সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া হঠাৎ গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সংসারে তাঁহার বৈরাগ্য হইল, প্রথম জীবনেই এতখানি দাগা পাইয়া, সামলাইয়া ওঠা বড় কঠিন। তিনি স্থির করিলেন, আর সংসারাশ্রমে থাকিবেন না। যখন ভগবান তাঁহাকে দিতে না দিতেই সকল স্নেহের জিনিষই কাড়িয়া লইলেন, তখন তাঁহারই ইচ্ছার জয় হউক, এ জীবন তো চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং জীবনের বাকী সময়টুকু ধর্ম্মসাধনেই অতিবাহিত করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। অনেক দেশ ভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু ভক্তের নিকটে সংশিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ভাগ্যক্রমে তাঁহার অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের সঙ্গ লাভ হইল, সুদূর হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম যাইবার পথে এক বৎসর কাল হিমালয়ের নির্জ্জন গিরিপথে পরিভ্রমন করিবার সময় এমন ভাব তাঁহার মনের মধ্যে প্রকাশ পাইল, যাহাতে তিনি সংসারের দাব-দাহে দগ্ধ-হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিলেন। যে সকল স্নেহের ধনকে অকালে নিষ্ঠুর কালের কোলে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়া যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়াছিলেন ; এবং ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরর্থক বুঝিলেও সমস্ত মন প্রাণ হইতে যে হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাকে তো অস্বীকার করিবার

সামর্থ্যে কুলায় নাই, এতদিনে কিন্তু তাঁহার প্রাণের সে বিষম জ্বালা জুড়াইয়া গেল।

যাহাদের হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেকে তিনি বড় রকমে বঞ্চিত হতভাগা বলিয়া মনে করিতেছিলেন, আজ তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাহাদের কেহই যেন আবার নাই, তাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের গোচরে তাহারা না থাকিলেও সমস্ত বিশ্বের মধ্যে অনন্ত প্রকৃতির দ্বারা যেন তাহাদের সান্নিধ্য উপলব্ধি হইতেছে। বিশ্বদেবতার চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া তিনি তখন বার বার প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে আমার প্রভু! তোমার যে কোনো বিধানের অর্থ বুঝতে না পারলেও নত হোয়ে তা'কে স্বীকার করবার শক্তি আমাদের দাও।" দশ বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি একবার নিজের জন্মভূমি দেখিবার ইচ্ছা করিয়া দেশে ফিরিলেন। দেশে পুরাতন লোক অনেকেই মরিয়া গিয়াছে, অনেকে কর্ম্মস্থানে গিয়া বসবাস করিতেছে যাঁহারা ছিল, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিল, তবে চেহারায় নয়—পরিচয়ে। তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়-আশয়, তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কুটুম্বরা আসিয়া অধিকার করিয়াছে, তিনি সে সকলের কোনও খোঁজ খবরও করিলেন না, করিলে সম্ভবতঃ তাঁহাকেই রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হইত, যেহেতু তাঁহার আকৃতির এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। গ্রাম হইতে ফিরিবার সময় ট্রেণে কয়েকটি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল, তাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া বারবার করিয়া তাঁহাদের বাসস্থানে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এতখানি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না, বীরভূমে আসিয়া রজনীর গৃহে সাদরে তিনি অভ্যর্থিত

হইলেন। অচিরে সনৎ, পরেশ, যামিনী প্রভৃতি তাঁহার অনুরক্ত হইয়া সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, তাঁহার নিকট শাস্ত্র ও ধর্ম্ম তত্ত্ব শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত খুসি হইত, বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল, তিনি ও চারিদিক কার এ অযাচিত শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলিকে অন্তরের সহিত গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। ক্রমে সকলের প্রতি তাঁহার এতটা মমতার আকর্ষণ আসিল—যাহার টানে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। একবার যাহাকে অকস্মাৎ সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া পথে পথে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছিলেন, আজ আবার তাহাকে হঠাৎ এতগুলি স্নেহের বাঁধনে বাঁধিবার যে কোনও এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা মানুষের বোধাতীত. ইহা নিশ্চয় জানিয়া সেই বিচিত্র লীলাময়ের উদ্দেশে তিনি ভক্তি-নত-চিত্তে বারবার প্রণাম করিলেন।

৫

"কোথা মা লক্ষ্মী, কোথা গো? এই যে আমার পুঁটু-দিদি বোসে কুট্‌নো কুট্‌ছে।"

পুঁটি বঁটি কাৎ করিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি গুরুদেবের পায়ের ধূলা লইল, তার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ও মা শীগ্‌গীর এস, কে এসেছেন দেখে যাও।"

সারদা দেওয়ালের ওপাশে ঘুঁটে দিতেছিলেন, পুঁটির ডাকে গোবর মাখা হাতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গুরুদেবকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "বাবা যে, হাতটা ধুয়ে আসি।" —বলিয়া খিড়কীর পুকুরে হাত পা ধুইয়া, মাথায় কাপড়টা টানিয়া

দিয়া, গুরুদেবের পায়ের কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ভাগ্যবতী হও মা, চিরায়ুষ্মতী হও" সারদা কহিলেন,—"বেঁচে থাকার আশীর্ব্বাদ আর করবেন না বাবা, মেয়েটাকে পাত্রস্থ কোরে ছেলেটাকে একটু বড় কোরে দিয়ে ম'ত্তে পাল্লেই বাঁচি। সংসারের হাঙ্গামা আর পোহাতে পারি না।"

গুরুদেব কহিলেন, "এরই মধ্যে এতো অধৈর্য্য হয়েছ মা! এখনও তো সংসারের অনেক পথ পড়ে আছে, এত সহজে অধৈর্য্য হ'লে চল্‌বে কেন?"

সারদা কহিলেন, "গরীবের বেঁচে থাকায় কি সুখ বাবা? ঠাকুরের কাছে কোন্ অপরাধ করেছি, যে অভাবের যন্ত্রণা আর কোনো দিন গেল না?"

গুরুদেব কহিলেন, "সুখ দুঃখ অনেকটা মা, মানুষের নিজের হাতে। মানুষের অভাব অনন্ত, অভাবের বোধেই অশান্তির সৃষ্টি, কিন্তু অল্পে যে তৃপ্ত, অল্পে যে সন্তুষ্ট, তার দুঃখ বা অশান্তি খুব কম।"

সারদা কহিলেন, "আমরা মূর্খ্যু মেয়েমানুষ—শাস্তরের বড় বড় কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না, তবে এইটুকু বুঝি বাবা, যে দু'বেলা একটু ভাল মত ভাত তরকারী স্বামী পুত্রের পাতে গুছিয়ে দিতে পারি, তাদের ছেঁড়া টেনা পরা দেখ্‌তে না হয়, গরীব দুঃখী বাড়ীতে কেউ এলে, হাত তুলে দু'মুঠো কিছু দিতে পাই,—তা হোলেই ঢের হোলো। এর বেশী আর ত কিছু চাই না, কিন্তু আমার পোড়া বরাতে বারমাস তা ঘটে কই? হা হা করেই চির-কালটা কাটাতে হোলো। আপনি একটু স্নেহ করেন, তাতেই আপনার কাছে দুটো মনের

কথা জানিয়ে বাঁচি, এবারে এসে তো ক'ই আপনি মেয়ে বলে মনেও করেন নি, সতীশকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে তবে পায়ের ধূলো পেলুম।"

গুরুদেব কহিলেন, "আমি আসতুম বৈ কি মা, তবে এসেই আসতে পারিনি বটে, সে জন্যে দুঃখ ক'রো না মা, তোমাদের মঙ্গল চিন্তা সর্ব্বদাই আমার মনের মধ্যে হয়, সংসারের কাছে ছুটী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু আবার তোমাদের টানে আমায় ফিরতে হয়েছে।"

এমন সময় সতীশ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া "দাদা, দাদা" করিয়া গুরুদেবের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সারদা হাঁ—হাঁ করিয়া কহিলেন, "হতভাগা, পায়ের ধূলো নে, একেবারে গায়ে পা ঠেকিয়ে দাঁড়ালি!" গুরুদেব সস্নেহে সতীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। অন্যান্য ছেলেরা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইত, তিনি আদর করিয়া ও তাহাদের সঙ্কোচের ব্যবধান-কে দূর করিতে পারেন নাই, কিন্তু দুরন্ত সতীশ একেবারে তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ উৎসকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া তুলিত; সুতরাং সতীশকে আলিঙ্গন করিয়া, ভালবাসিয়া, তিনি বহুদিনকার বিস্মৃত সেই পুত্রালিঙ্গন সুখ অনুভব করিতেন।

সারদা কহিলেন, "ঠাণ্ডা হোয়ে বোস্ খোকা, এখন মাথা-মুণ্ড কিছু বাজে কথা বকিস্ না, দুটো কাজের কথা আমায় ক'ইতে দে।"

সতীশ অতি কষ্টে নিজের মনের মধ্যকার শত শত প্রশ্নগুলিকে প্রকাশ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিল, যেহেতু দাদার মতন সহিষ্ণু শ্রোতা আজ পর্য্যন্ত তাহার ভাগ্যে জোটে নাই, এবং দাদার নিকট

সে তাঁহার যে বিচিত্র দেশ ভ্রমণ কাহিনী শ্রবণ করিত, তাহাতে তাহার অত্যন্ত আনন্দ ও কৌতুক বোধ হইত, এবং সঙ্গীদিগের নিকটে, সে সকলের বর্ণনা করিয়া নিজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বাহবা লইত। সুতরাং সেই দাদাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া সে কি এখন বোবার মতন বাক্‌শক্তি হীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? তবে মাতার নিষেধ—সে চুপ করিয়াই রহিল। সারদা কহিলেন, "পুঁটী তো দশ পেরিয়ে এগারোতে পা দিলে, এখনও পর্য্যন্ত বর খোঁজার তো নাম নেই। পাড়ার লোক এখন থেকেই সাতবার কোরে মেয়ের বিয়ের কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছে। বামুন-কায়েতের ঘরে সময়ে মেয়ের বিয়ে না দিলে লোকে পাঁচ কথা বল্‌বেই, উনি কিন্তু কোনও কথা কাণে তোলেন না, দিব্যি নিশ্চিন্তি হয়ে আছেন, জোর কোরে বল্‌তে গেলে বলেন,—পুঁটি এখন ছেলে মানুষ, এখুনি কিসের বিয়ে!—তা বাবা, বর কিছু খুঁজলেই তো আর এখুনি পাওয়া যাবে না, মেয়েও কিছু সুন্দরী নয়, তার ওপর পয়সার জোর নেই, এখন থেকে অনেক খোঁজা-খুঁজি ক'র্‌তে হবে। আমার তো ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয় না। আপনি এখন এসেছেন, দয়া কোরে ওকে বুঝিয়ে বলুন যদি সুমতি হয়, নইলে তো আর কোন উপায় নেই। বিবাহের কথা শুনিয়া পুঁটি পাড়ার মিত্রদের বাড়ী পালাইল, মিত্রদের মেয়ে শোভা বা শুভি তার "বকুল"।

গুরুদেব কহিলেন, "মেয়ে তোমার—অবশ্য এখন দু'বছর দেরীতে বিয়ে দিলেও চল্‌বে, তবে আজকালকার দিনে সুপাত্র মেলা সুকঠিন, বিশেষ বিবাহে যখন পণ প্রথা রয়েছে।" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া গুরুদেব আবার কহিলেন, "রজনীর ভাইপোটির জন্যে

শুন্‌লুম ক’নে খুঁজছে, ছেলেটি সুপাত্র, তা পুর্ণেন্দুর সঙ্গে কি বিয়ে হয় না ?”

সারদা কহিলেন, “তা কি হয় ? আমরা মৌলিক কায়স্থ ; ওরা কুলীন, ঐটি বাড়ীর মধ্যে বড় ছেলে, কুল কর্‌বে ব’লে সাতাসের পর্য্যায় কুলীনের মেয়ে খুঁজছে। পূর্ণেন্দু হীরের টুক্‌রা ছেলে—বি, এ, পড়েছে, অমন জামাই কি আমার ভাগ্যে আছে ?”

গুরুদেব কহিলেন, “ভেবো না মা, কোনো উপায় হবেই আমি এ সম্বন্ধে খোঁজ ক’রব। যামিনীর ছেলে প্রফুল্লর সঙ্গে দিলে হয় না ? তবে সে এখন ছেলেমানুষ—বিজয়ের কি চাষবাসেও কিছু সুবিধে হোলো না ? চল্‌ছে কি করে ?”

সারদা কহিলেন, “কি কপাল নিয়ে যে পৃথিবীতে এসেছিলাম, তা বল্‌তে পারি না। ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না। কিছু জমী নিয়ে চাষ করেছেন, ফসলও এবার হবে, তা যে বাজারে দেনা হয়েছে, ধান্ হবা মাত্রই বেচে কিছু ঋণ শোধ করতেই হবে, তার পর সোম্‌-বছর আবার সেই হাহাকার। তরমুজের চাষটা খুব ভাল হয়েছে, তাও তো ফুরুলো। তা লাভ বেশী কিছু হয়নি। সেদিন হিসেব করলেন, পাঁচশো তরমুজ ফলেছিল, তার মধ্যে তিনশ’ বিক্রী হয়েছে, বাকী দুশো বিলুতেই গেছে। লোক্‌কে কখনো কিছু হাত তুলে দিতে পারি না, দিয়ে একটু মনের তৃপ্তি হ’লো, আর জিনিষও খুব উৎকৃষ্ট হয়েছিল, সবাই খেয়ে খুসী কত! তা যামিনীবাবুর স্ত্রী বল্‌ছিলেন, কায়েৎ-বামুনের ছেলের কি শুধু চাষ করে পোষায় ? একটা বাঁধা চাক্‌রী না করলে চল্‌বে কেন ? উনি যে কোনো বাঁধা কাজ করতে চান্ না, অথচ এদিকেও চলে না। ছেলের একটা টাকা স্কুলের

মাইনে, তাও দিয়ে উঠ্‌তে পারি না। তবে ও পড়ে ভাল, মাষ্টার, পণ্ডিত সবাই খুব ভালবাসে।"

এই সময়ে বিজয় কিছু তরকারীর পুঁটুলী লইয়া বাড়ী ঢুকিল, পশ্চাতে নিতাইচরণ। সে জাতে হাড়ী, সম্প্রতি জেল্ খাটিয়া আসিয়াছে, সেজন্য সহজে কেহ তাহার ছায়া মাড়াইত না, কিন্তু বিজয়ের সহিত ঘনিষ্টতা তার খুব বেশী।

বিজয় কহিলেন, "গুরুদেব যে। পুঁটি কই? এই আনাজ-গুলো রেখে দিক্। জমী দেখ্‌তে গেছ্‌লুম্, ভিমু-মিঞা তার ক্ষেত থেকে কিছু আনাজ দিলে।"

সারদা উঠিয়া চুপ্‌ড়ী আনিতে গেলেন, নিতাই গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া কহিল, "বাবাঠাকুর, পায়ের ধূলো দিন্। আপনার সাথে দেখা হোয়ে ভালই হোয়েছে, আমি তো মুখ্যু মানুষ, কিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝতে পারি না,— যা কিছু করি, শুন্‌তে পাই, সেইটেই আমার অন্যায় হয়েছে, সবাই মিলে আমায় চারদিক থেকে যেন খোঁচাচ্ছে। কাউকে দুটো ভাল কথা যদি সোধাতে যাই, পাগল বোলে তাড়িয়ে দেয়; আমি তাই ভাবি, পাগল—তারা; কি আমি!"

বিজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা সূত্রে নিতাই গুরুদেবেরও স্নেহের পাত্র ছিল, বিশেষ গুরুদেবকে নিতাই যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইত তাহাতে স্নেহ না করা অসম্ভব। গুরুদেব কহিলেন, "কি হোলো নিতাই? কি বুঝতে চাও তুমি? একটু স্থির হোয়ে বোসো। তোমার চেহারা যে ভয়ানক বিশ্রী হয়ে গেছে।"

৬

বিজয় জুতা খুলিয়া, হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বসিলেন, নিতাইএর বাক্যস্রোতকে ঠেকাইয়া কহিলেন, "অতো কথা তোর চুলোয় যাক্, তুই হতভাগা দু'আঁটি ধান চুরি করতে গেলি কেন? ঐ সামান্য দু'চার মুঠা ধানের জন্য ছ'মাস জেল খেটে এলি!"

নিতাই কহিল, "আমার নসীবের ফের দাদাবাবু, আমার হাল আর কেউ না জানুক, বিশ্বাস না করুক, আপনার তো কিছু অজানা নেই! সেবারে শা-বাবুদের হ'য়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে যাইনি বলে, দেখলেন তো আমার কি নাকালটা হ'লো!—শেষকালে রাজী হ'য়ে দিতে গেলুম, কিন্তু উকীলের জেরায় টিঁকতে পারলুম না, উল্টো চাপ আমার ঘাড়ে দিয়ে শেষে আমায় তিনমাস কয়েদ খাটতে হোলো: সেই থেকে দাগী হয়ে রইলুম। সব জায়গায় কাজ ও পাই না, বউ মাগী তো ম'রে বাঁচ্‌লো, তিন্‌টে ছেলে-মেয়ে আমার ঘাড়ে দিয়ে গেল। তিনদিন কাজ হয়নি, ছেলেমেয়েগুলো শুকিয়ে থাকে, আমি বাড়ীতে পা দিলেই খেতে চায়, কেউ বলে, একটা পয়সা দে বাবা, কেউ বলে মুড়ি খাব, ছোট-টা বলে ভাত খাব—খিদে পেয়েছে। ধার চাইতে গিয়েও কোথাউ দু'চার পয়সা পেলুম না, তখন ভিক্ষে ক'রতে বেরুলুম, যে দেখে, তাড়া দেয়, বলে, জোয়ান মিন্সে, খেটে খেগে যা—ভিক্ষে করিস্ কোন্ লজ্জায়? লজ্জায় আপনার কাছেও আস্‌তে পারিনি, ছেলেগুলো বুঝি একদিন এসে বউ ঠাকুরনের পেসাদ পেয়ে গেছ্‌লো। রাত্তির বেলা মাঠ দিয়ে আস্‌ছি, দেখলুম মজিদ্-মিঞাদের ধান কাটা, আঁটি বাঁধা পড়ে আছে—তাই দু'আঁটি নিয়ে চলে আস্‌ছিলুম,

রাস্তায় কনেষ্টবল ব্যাটা ধরলে, কত কাকুতি-মিনুতি করলুম কিছুতেই ছাড়ে না, বলে "মদ খেতে দু'আনা পয়সা দে"—"আরে, আমিই আজ তিনদিন থেকে সিকি পয়সার মুখ দেখ্‌তে পাইনি, তোকে কোত্থেকে দোব!" এই সময় ইনস্পেক্টর ঘোঁড়ায় চ'ড়ে রোঁদে বেরিয়েছিল, কনেষ্টবলকে জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপার কি?" সে ব্যাটা বল্‌লে "চোর ধরেছি হুজুর" আমিও কবুল করলুম, কনেষ্টবল যে ঘুস চাইছিলো, তাও বল্‌লুম, কিন্তু কনেষ্টবল সে কথা সাফ্‌ উড়িয়ে দিলে। এদেশে তো জানেন দাদাবাবু, ধান কাটার সময় কত ধান, কত গরীব লোকে কুড়িয়ে নিয়ে যায়, কত আঁটি চুরিও যায়, তাতে কারু ও গায়ে লাগে না, মজিদ্‌-মিঞাদের তলব হোলো, তারাও এ মকদ্দমা ল'ড়তে চাইলে না, কিন্তু বলিহারী আদালতের বিচার,—তবু আমার জেল হ'লো। একবার কার দাগী, কাজেই ছেড়ে দিতে পারে কি?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই আবার কহিল, "যাই হোক, জেলে গিয়ে বড় মন্দ হয়নি, তিন মাস ভাতের জন্যে ভাবতে হয়নি, দু'মুঠো খেতে পেয়েছি, তবে ছেলেগুলোর লেগে কল্‌জেটা জ্বলে যেত, তা তারা এর দুয়োরে ওর দুয়োরে দু'মুঠো ভিক্ষে-সিক্ষে কোরে দিন কাটিয়েছে। তাতেই বল্‌ছি, কত লোক চুরি ডাকাতী কোরেও কেমন আইনের চোখে ধুলো দিয়ে সাধু সেজে দিন কাটাচ্ছে, আর আমি মিনি দোষেই দু' দু-বার জেল খেটে এলুম। কলিকালে কিছুই ন্যায় বিচার নেই।" সারদা শুনিয়া কহিলেন—"সবারি একদিন পড়ে আছে নিতাই। অভাবে পড়েও যে স'য়ে থাকে, তার প্রতি ভগবান একদিন মুখ তুলে চাইবেন-ই।

আমরা মহাপাপী, সেই কথাটি মনে রাখ্‌তে পারিনা বলেই তো এই কষ্ট।"

নিতাই হতাশভাবে কহিল, "আর বউ ঠাক্‌রুণ, ভগবানের আশা তুমি কি করছ? তিনি কি আর চেয়ে আছেন? হয় তিনি কুম্ভকর্ণের মতন পড়ে অসাড় হোয়ে ঘুমুচ্ছেন, না হয় তো কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন—তাঁর আনাড়ী ছেলেকে রাজ্যটা ছেড়ে দিয়েছেন।" সতীশ হাত তালী দিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"কি মজা, ভগবান কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছেন। তবে তো তাঁর ঘুম ভাঙলে ছ'মাসের খোরাক একদিনে খাবেন! আমাদের রামায়ণে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর কথা লেখা আছে—ভারী মজার!"

বিজয় কহিলেন,—"হ্যাঁরে পাগ্‌লা, কি দেখে তুই সিদ্ধান্ত করলি যে ভগবান হয় কাজে ইস্তফা দিয়েছেন, নয় ঘুমুচ্ছেন। তোর এ নূতন তত্ত্ব সভ্য জগতে প্রচার হোলে. তোর নামে চারদিকে যে জয়ঢাক বেজে উঠ্‌বে।"

নিতাই কহিল,—"দাদাঠাকুর! আপনি হাসুন আর যাই করুন, আমি কিন্তু ঐ কথাই সার বুঝেছি,' তা না হলে পিথিমীতে এতো অবিচার চল্‌ছে কেন?. এত অনিয়ম কেন? ঐ—যে একটা শোলোক আছে. "যে করে পাপ, সে সাত বেটার বাপ। যে করে পুণ্যি, তার ঘর শুন্যি" তা—তো দেখ্‌ছি, খুব মিথ্যে না। কেন এমন হয়? সত্যিই তো কিছু পুণ্যির চাইতে পাপ বড় নয়? কিন্তু হোলে কি হয়. রাজা নিজে যেমন রাজকার্য্য না দেখ্‌লে, দেশে যেমন ঘোর অনিয়ম আর অবিচার চল্‌তে থাকে, তাই আজ কাল পুরো দমে চল্‌ছে। তাতেই বলি ভগবান ঘুমুচ্ছেন। শাস্ত্রে যে বলে, কত কোটী বছরে ব্রহ্মা ঠাকুরের এক রাত্তির, তবে এখন

তাঁর সেই রাত্তির-ই পড়েছে, সে রাত্তির পোহাতে কত বছর/ কত যুগ ওলট-পালট হোয়ে যাবে। আর যদি না বলেন, তবে ভগবান অবসর নিয়েছেন, তাঁর কাজের ভার যে নিয়েছে, সে এখনও ভাল কোরে সব কাজ বুঝে নিতে পারে নি। নইলে দেখ্‌ছ না দাদাঠাকুর! গেল-বছর বর্ষার সময় কাট্‌-ফাটা রোদ্দুর হোতে লাগলো, আর কার্ত্তিক মাসে কি ভাসানটাই না হোয়ে গেল! আগে যে ছয় ঋতু হোতো, এখন তা ঠিক মতন হয় কই! আবার দেখুন—ভুবন ময়রার বাপ, বড় বাবুদের মকদ্দমায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে একেবারে বড়লোক বনে গেল। বাবুরা মকদ্দমা জিতে খুসী মনে চার-শো টাকা বক্‌সীস্ দিলে, সেই টাকায় সে জোৎ জমা ক'রে গেছে, ছেলে পিলে এখন তাই নেড়ে চেড়ে বসে খাচ্ছে। এসব দেখে শুনে কি মনে হয় দাদাবাবু—তাই আমায় বল।"

এই সময় সনৎ ও পরেশ বাহির হইতে ডাকিলেন, "ওহে বিজয়! বাড়ী আছ কি?" বিজয় উত্তর দিলেন,—"আছি ব'লেই তো মনে হয়, ভেতরে এস হে।" উহারা আসিতেই সারদা উঠিয়া রান্নাঘরের কাজে গেলেন। 'গুরুদেব কহিলেন, "তোমরা বুঝি যামিনার বাড়ী থেকে ফিরছ?" সনৎ কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম, তাই একবার এলুম। এদিকে আবার কাছারীরও সময় হ'য়ে আসছে।"

বিজয় কহিলেন, "একটু ব'সে যাও হে, এইতো সবে বেলা ন'টা, তোমাদের ত এগারটায় কাছারী বসে। নিতাই নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে শুনে নাও—হয় ভগবান ঘুমুচ্ছেন, না হয় তিনি কর্ম্ম ভার থেকে অবসর নিয়েছেন।—হাঃ হাঃ হাঃ।"

সনৎ বসিতে বসিতে কহিলেন, "হ্যাঁরে নিতাই, জেনে কি

তোকে গুলি-টুলি বরাদ্দ করেছিল? মাথায় যে খুব কল্পনার গাছ-গাছড়া গজাতে সুরু হয়েছে। দু' একখানা বই-টই লিখে ফ্যাল্।"

নিতাই কহিল, "আমরা কি বই লিখ্‌বো বাবু, মুখ্যু গোঁয়ার লোক; যা মনে হয়, তা পেটে রাখ্‌তে পারি না ব'লে ফেলি—তাতে গাঁজাই খাই আর গুলিই খাই।"

পরেশ কহিলেন, "আচ্ছা তোর এ কুবদ্ধি কেন হ'ল? চুরী কেন করতে গেলি?"

নিতাই কহিল, "আচ্ছা বাবু চুরি করলেই কি পাপ হয়?" সনৎ মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "ন্যাকা আর কি? তাই আবার জিজ্ঞেস্ করছিস্? পাঁচ বছরের ছেলেও যে সে কথা জানে।"

মহোৎসাহে সতীশ তখন আবৃত্তি করিল, "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ। আমাদের দ্বিতীয় ভাগে লেখা আছে;—আবার কালকে রিডারে পড়ছিলুম "To steal is a sin চুরি করা পাপ।"

সনৎ কহিলেন, "শোন্ হতভাগা, ছেলেতে কি বল্‌ছে তাই শোন্।"

নিতাই কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিল—"আর কেড়ে নিলেও পাপ?" সনৎ মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "নয় তো কি? একটা চুরী, আর একটা ডাকাতী।"

নিতাই পুনরায় প্রশ্ন করিল "তুচ্ছ জিনিষ একটা নিলেও তার নাম চুরী?"

সনৎ উৎসাহের সহিত কহিলেন, "নিশ্চয়। তুমি আমায় না ব'লে আমার বাড়ীর একমুঠো ধূলো নিয়ে গেলেও সেটা চুরী ব'লে গণ্য, আর আইন মতে তুমি দণ্ড পেতে বাধ্য।"

নিতাই কহিল, "বেশ কথা বাবু, এইবার আমি কিছু বলি শুনুন, ক্ষ্যাপার কথায় রাগ করবেন না। যিনি হাকিম, যিনি আইন মতে এজলাসে ব'সে বিচার করেন, দিন—কত লোকের চুরীর শাস্তি দেন, তাঁর বাড়ীর ছেলেরাও তো কাছারীর নিপ্ বা কালী নিয়ে লেখে, তাহ'লে সেটাও তো চুরী হ'লো। আমি এক মুঠো ধান চুরী ক'রে জেল খেটে দাগী হলুম, আর এ রকম তুচ্ছ চুরীর জন্যে যদি শাস্তি হয়, তাহ'লে তো ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজোড় হবে। আইনের কথা বলছেন বাবু, সেও তো মানুষেরই গড়া। ভগবান কিছু সেটা গ'ড়ে দেন-নি। ডাকাতীতে যে পাপ হয় বলছেন, তাহ'লে যারা রাজা মহারাজা তাঁরা তো মহাপাপী। মহাভারতে যে শুনি রাজারা দিগ্বিজয় ক'রতে বেরুতেন—তার মানে ডাকাতী ক'রতে বেরুতেন, অথচ যিনি যত বেশী রাজ্য দখল ক'রতে পারতেন, তাঁর তত জয়-জয়কার হ'তো। এখনও তো তাই। তাহ'লে চুরী-ডাকাতীর অর্থ তো খুব জট পাকিয়ে গেল।"

সনৎ ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, "তুমি ব্যাটা পাকা বদমাস্। একেবারে শাস্ত্র খুলে বসেছ। নিতাই কহিল, "আর একটা কথা ব'লে নিই বাবু; আপনার যদি তিনদিন তিন রাত্তির আহার না জোটে, ছেলে মেয়ের মুখে একটি দানাও না দিতে পারেন, আর ক্ষিদেয় তারা আপনার চোখের উপর ছট্‌ফট্ ক'রতে থাকে, তাহ'লে আপনি কি করেন ?"

ছোটলোকের এতখানি ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সনৎ কহিলেন, "তোর মতন চুরী ডাকাতী ক'রে বেড়াই। মুখ সাম্‌লে কথা বল্। গুরুদেব আপনি এখানে ব'সে ধৈর্য্য ধ'রে এই সব অশ্রাব্য কথা গুলো শুন্‌ছেন ?"

গুরুদেব মৃদু হাসিয়া শান্তভাবে কহিলেন, "রাগ ক'রো না সনৎ। স্বাধীন মন, স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি—ভগবান সকলকেই দিয়েছেন, তা সে ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্। মনের সঙ্গে সায় না মিল্‌লেই যে চটে উঠ্‌তে হবে, তার কোনো মানে নেই। যদি পার ত যুক্তিতে জয় ক'রতে হয়। সেটা শুধু রাগের ছাড়া কি তর্কের দ্বারা হয় না? অবস্থা বিশেষে মানুষের চিন্তাশক্তির বিভিন্ন পরিবর্ত্তন না হ'য়ে পারে না, সুতরাং মনে রেখ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আমাদের বড় বেশী প্রয়োজন।"

পরেশ কহিলেন, "বিজয় তুমি তো ঘোর অদৃষ্টবাদী, নিতাইও তোমার খুব অনুগত, তবে কেন তোমার ঐ অদৃষ্ট-বাদটায় বিশ্বাস করিয়ে দাও না, তাহ'লে ও আর এক-আধদিন খেতে না পেলে অদৃষ্টের ওপরে কারচুবী ক'রে কারো বাড়ী চুরী করতে দৌড়ুবে না।"

সনৎ কহিলেন, "বেশ বলেছ। এখন উঠে পড়া যাক্, আসুন গুরুদেব।—না, আপনি একটু ব'সবেন বুঝি!" গুরুদেব কহিলেন, "আমি একটু পরেই যাচ্ছি, তোমরা যাও।"

৭

যামিনী বাবুর কন্যার বিবাহ। গায়ে হলুদের দিন বেশ ধুম-ধাম হইতেছে, মেয়ে-যজ্ঞি, ব্যাপার গুরুতর। সকাল হইতে অনবরত দু'খানি গরুর গাড়ী বোঝাই ও নামাই হইতেছে! যামিনী বাবুর দুইখান বড় ঘর ও বারেন্দায় মেয়ের দল গিস্ গিস্ করিতেছে, রঙ-বেরঙের চওড়া পাড়ের শাড়ীর ও হাল-ফ্যাসানের গহনার

জলুস দেখে কে? মেয়েরা আপন আপন সংসার লইয়াই বিব্রত—বড় একটা দেখা শুনা হইয়া উঠে না, কারও বাড়ী কখনও কাজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরস্পরের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে, সুতরাং পারত পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই পাছু হন্ না। আজ পরিচিতারা পরস্পরের মধ্যে সখ্য ও প্রীতিভাব বেশ করিয়া ঝালাইয়া লইতেছে। কন্যার বিবাহ, পুত্রের বিবাহ, কুটুম বাড়ীর সংবাদ, ঘর-গেরস্থালীর নূতন খবর, পিত্রালয়ের কাহিনী তা ছাড়া আর কি গহনা পত্র নূতন গড়ান হইয়াছে এই সব খুঁটি-নাটি সংবাদ দিতে নিতে, শুনিতে ও শোনাইতে ব্যস্ত। কেবল নব-বিবাহিতা কিশোরী ও যুবতীর দল একটু পাশ কাটাইয়া বসিয়া সাগ্রহে নিজ নিজ পতির ভালবাসার কথা, চিঠি পত্র লেখার গল্পে মশ্‌গুল হইয়া আছে। সারদা মেয়েটিকে পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যামিনী বাবুর স্ত্রী—প্রফুল্লকে পাঠাইয়া সারদাকে আনাইয়াছিলেন। প্রফুল্লর হাত ছাড়ান সারদার সাধ্য নয়। রজনী বাবুর স্ত্রী, নিরাভরণা সারদার দিকে চাহিয়া বলিতেছিলেন, "ঠাকুরপো যেন কি! শুধু হাতে কি মানুষ লোকালয়ে বেরুতে পারে? দু'গাছা বালা আর এক ছড়া হার কি এ পর্য্যন্ত আর গড়িয়ে দিতে পারলে না?—" ইত্যাদি। সারদা ইত্যাদি-মন্তব্য শুনিবার ভয়েই আসিতে চাহে নাই, কুণ্ঠাভরে কহিল, "আর দিদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে, শাঁখা-সিঁদুর বজায় থাকুক, এই আমার গহনার সেরা গহনা" ভুবন বাঁড়ুয্যের স্ত্রী, যিনি রমণী কুলের অগ্রণী (বংশ গৌরবেও বটে, অলঙ্কার বাহুল্যেও বটে, এবং বিশেষ করিয়া শারীরীক আয়তনে) নানা রত্নালঙ্কার বিভূষিত বৃহৎ বপুখানি ঈষৎ আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "ও মা,

বিজয়ের বউ এসেছিস্? তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। তোর ছেলে সে'দিন তরমুজ দিয়ে এসেছিল, -খাসা জিনিষ। পুঁটি কই? সে কত বড় হ'লো? এই যামিনীর মেয়ে ভূতিরই জুটি না? বিয়ের কি করছিস্?"

সাষ্টাঙ্গে পায়ের ধুলা লইয়া কহিলেন, "কি ক'রবো মাসী-মা, বর তো খুঁজছি, এখন মেয়ের বরাত, পয়সা কড়ি নেই, এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালয় ভালয় একটা কিছু জুটলে হয়।"

"আহা জুটবে বই কি? তোর মেয়ে রং একটু ময়লা হলেও ছিরি আছে, আবার বয়েস কালে রং আরো খানিক বদলে জেল্লাও খুলবে। তা দোজ্পোরে গৌজ না হলে খাঁই কিছু কম হবে, আর পরিবারের যত্ন ও তারা ভাল ক'রেই ক'রবে, দু'খানা গায়ে পরতেও পাবে। চ্যাংড়া ছোঁড়ারা কি ভাল ক'রে স্ত্রীর আদর যত্ন করতে পারে?"

সভামধ্যে একটা হাসির লহর খেলিয়া গেল, যাঁহারা দ্বিতীয় পক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের চোখে মুখে একটা গৌরব-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। ভুবন-গৃহিণী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তা তোরা যা'ই বল, আর যাই কর, আমি এই বয়েসে ঢের দেখেছি।" সতীশ হোক, আমার বড় ছেলের-ছেলে সোনার সঙ্গে পড়ে, না? সে নাকি ক্লাশে ফাষ্ট থাকে। আহা বেঁচে থাক্, আর তো হ'লো না, সবে ঐ ক্ষুদ গুঁড়োটুকু। তা বিজয় এখন করছে কি? এই নলিনী, বিজয়, পরেশ, অনু সবাই এক সঙ্গে প'ড়্তো। তখন তো ইংরিজী স্কুলের সবে পত্তন। আমাদের বাইরের আটচালায় স্কুল বোস্তো। আহা, সব যেমন সে দিনের কথা। আমার ঘরে সব আড্ডা ছিল, কত উপদ্রব করতো, দুপুরের জল-

খাবার ছুটিতে—ওদের কাসুন্দি আর কুলের আচার আমায় নিত্যই দিতে হোতো, নইলে রক্ষে ছিল না। এখন তারাই আবার ছেলে-মেয়ের বাবা হ'য়ে তাদেরই বে-থা দিচ্ছে। আহা, সব বেঁচে-বর্ত্তে থাক্, দেখে সুখ—শুনে সুখ।"

সভায় এত স্বর্ণাভরণা সুসজ্জিতা বউ ঝি থাকিতে এই দরিদ্র আভরণ-হীনা বিজয়ের স্ত্রীর সহিত, ধনাঢ্য গৃহিণীর এত সস্নেহ-সম্ভাষণ অনেকেরই ভাল লাগিল না, এই সময়ে যামিনীর ভগ্নী শশি শশব্যস্তে আসিয়া কহিলেন, "ওঠো ভাই, তোমাদের পাত হয়েছে,—আসুন মাসী-মা, বড্ড বেলা হয়ে গেছে, তবু ভোরেই রান্না চাপান হয়েছিল।"

ভুবন-গৃহিণী স্থলকায়-প্রযুক্ত সহজে ওঠা বসা করিতে পারিতেন না, তাঁহার ঝি তাঁহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিল, সারদাও গিয়া অপর দিকে ধরিয়া উঠাইয়া দিল। যে সকল মহিলারা ভুবন-গৃহিণীর সৌভাগ্য ও অলঙ্কার রাশিতে মনে মনে ঈর্ষা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাঁহারা কিন্তু তাঁহার এ বিপুল-বপু খানির দিকে চাহিয়া আর ঈর্ষা করিতে পারিলেন না। ভুবন গৃহিণী চলিতে চলিতে কহিলেন, "দ্যাখ্ শশী! সেবারের যতীন উকীলের বাড়ীর মতন কেলেঙ্কারী যেন না হয়, পরিবেশন সমান ভাবে করবি—মুখ চিনে, আর গয়না গুণে পরিবেশন আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। যাদের আদর কোরে আজ তোর বাড়ীতে পাত পাড়্‌তে ডেকেছিস, তারা গরীব হোক্, বড় লোক হোক সবাই সমান। দাসী-বাঁদী যদি হয়, তারও সেই সমান আদর করবি, বুঝলি?" তাঁহার এ মূল্যবান উপদেশ অনেকেরই ভাল লাগিল না,—বিশেষ করিয়া যাঁহারা তাগা-তাবিজের বাহার দেখাইবার জন্য সে গুলা

জ্যাকেটের উপরেই পরিয়াছিলেন, গলায় নেক্‌লেস, চিক ঢাকা পড়িবার ভয়ে ভাল করিয়া গায়ের কাপড় ঢাকা দিতে পারিতে-ছিলেন না।

সারদাকে আবার বসিতে দেখিয়া, শশী ডাকিলেন। "তুমি বোসে রইলে কেন বউ?—এসো, বেলা কত হয়েছে।" সারদা কহিলেন, "এক সার্ হোয়ে যাক্, আমি তোমাদের সঙ্গে বোস্‌বো ঠাকুর-ঝি।"

ঠাকুর-ঝি কহিলেন, "আঃ কপাল, আমাদের আজ কখন খাওয়া হবে, তার কি ঠিক্ আছে? তবে এ সার্‌টা হোয়েই যাক্" সকলে চলিয়া গেলেন, পুঁটি আসিয়া কহিল, "মা তুমি খেতে গেলে না, ছোট ছেলে-মেয়েদের হয়ে গেল. আমি খেয়ে এলুম।" এই সময় প্রফুল্ল আসিয়া কহিল, "কাকীমা খেতে যাও নি? এই যে পুঁটি, দিন দিন কি ঢ্যাঙাই হচ্ছিস্!"

পুঁটি কহিল. "তুমিও তো হ'চ্ছ প্রফুল্ল-দা!" প্রফুল্ল কহিল, "জানিস্ পুঁটি, তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, আজ সকালে যে আমাদের শুভির বিয়ের সম্বন্ধ করেছে, সেই ঘটককে বিজয় কাকা বল্‌ছিলেন। এইবার তোর ঘুটিং খেলা, পুকুরে সাঁতার দেওয়া, আর সন্ধ্যে বেলায় পুকুরে চিংড়ি মাছ ছেঁকে ধরা বেরুবে, কলা বউ হোয়ে ঘরের কোণে ঢুকে থাক্‌বি।" "বেশ্ তোমারও বোয়ের বেরুবে।"

স্বাধীনতা লোপের এত খানি ভীতিপ্রদ কথা শুনিয়া পুঁটি রাগিয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রফুল্লর উপর তাহার শোধ লইতে না পারিয়া, তাহার অপরিচিতা, অনাগত ভাবী বধূটির উপরেই চোট পড়িল, প্রফুল্ল তখন বিনা বাক্যব্যয়ে পুঁটির মাথা হইতে প্রজাপতিটি খুলিয়া লইয়া চম্পট দিল; পুঁটি তাড়া করিয়া পিছনে দৌড়িল, অগত্যা

প্রফুল্ল সে'টি ফেরৎ দিয়া কহিল, "এই নে রাক্ষুসী, তোর বিয়ের দিন নিজের হাতে আমায় দই সন্দেশ খাওয়াবি, নইলে দেখ্‌বি মজা—" এমন সময় শোভা ও ভূতি আসিয়া পড়িল। শোভা ডাকিল "বকুল, একটা কথা বলি শোন্! ভারি মজার।—ঘুঁটের নেকলেস তৈরি কোরে,—বুঝলি?" বাকি কথাটা উহ্য থাকিলেও পুঁটির তাহা বুঝিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইল না, সে হাত তালি দিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "বেশ হবে, কেমন ভূতি?"

শোভার বিবাহের রাত্রে ভূতি শোভার বরকে ঐ রকম হার পরাইয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল, আজ শোভার শোধ লইবার পালা।

প্রফুল্ল কহিল, "পোড়ারমুখী-গুলোর এই সব ফন্দী হচ্চে; দাঁড়া পিসীমাকে বোলে দিচ্চি।"

পুটি কহিল, "না প্রফুল্ল-দা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি বরং গেঁথে দাও। আমরা তো পারবো না,—কি বল্ শুভি?" এ প্রস্তাবে প্রফুল্ল আর অসম্মত হইতে পারিল না এবং মেয়েদের কাছে মুরুব্বিয়ানা দেখাইতে পারিবে বলিয়া খুসী হইল, উহাদের মধ্যে যখন এই সব জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, সারদা তখন গৃহের মধ্যে বসিয়া মনে মনে কহিতেছিলেন, "হে মা কালি! দশটা না, পাচটা না একটা মেয়ে। ভালয় ভালয় একটি ঘর-বর জুটিয়ে দাও মা! আহা, প্রফুল্লও ছেলেটি বেশ, পুঁটার সঙ্গে ভাবও খুব, বিয়ে হোলে কেমন মানাত! তা সে কপাল কি করেছি? পয়সা নেই, কড়ি নেই, কিসের জোরে জোর করি? বামন হোয়ে চাঁদ হাতে দেবার সাধ যে। তবে বলাও যায় না; মেয়েমানুষের বরাত, রাণীও হয়—বাঁদীও হয়।

৮

পৌষ মাসের প্রথমে শীতটা তেমন বেশী পড়িতে পায় নাই, অসময়ে আকাশ-জোড়া মেঘে শীতকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে, চাষা-ভূষারা জোড় হাত করিয়া ভগবানকে ডাকতেছে—যেন বৃষ্টি আর বেশী না হয়, এখনও অনেকের মাঠে ধান কাটা হয় নাই, সে গুলি তাহা হইলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে। রজনীর বাহিরের ঘরে, বন্ধুগণ সমবেত হইয়া চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছেন, বিজয় ও আসিয়া জুটিয়াছিল সুতরাং কথা বার্ত্তা জমিতেছে ভাল। রজনী বাবুর নিজের সন্তানাদি নাই, পূর্ণেন্দুকেই তিনি মানুষ করিতেছেন, সম্প্রতি পূর্ণেন্দুর বিবাহ দিয়াছেন। পূর্ণেন্দু এবারে বি-এ পরীক্ষা দিবে, কুটুম্ব ভালই হইয়াছে, বধূটিও সুন্দর হইয়াছে, নগদ টাকা না পাওয়া গেলেও বর-কন্যার যৌতুক ও কন্যাভরণে বেশ মোটা রকম টাকাটাই ঘরে আসিয়াছে, গত কল্য কুটুম বাড়ী হইতে পাঁচের তত্ত্ব আসিয়াছে, সুতরাং রজনী আজ বন্ধুদিগকে সে সকলের স্বাদ গ্রহণ করাইতেছেন।

পরেশ বলিতেছে, "ওহে যামিনী! প্রফুল্লরও শীগ্‌গীর একটা বে-থা দিয়ে ফ্যালো, আমরা মাসে মাসে তা হোলে তত্ত্ব-তাবাসটা খেতে পাই।" রজনী বলিলেন, "না—না, আই-এ টাই পাশ করুক। পূর্ণেন্দুর ই এখন বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে ছিল না, কি করি গৃহিণীর নিতান্ত জেদ, বলেন একলা বাড়ীতে থাক্‌তে পারি না, কাজেই দিতে হোলো।"

বিজয় কহিলেন, "বেশ করেছ, ছেলের বিয়ে দিয়ে পোঁট্‌লা-

পুঁটলী বেঁধে তোমার বুক দশহাত হয়েছে, এদিকে দেখে শুনে আমার বুক সাতহাত ব'সে যাচ্ছে, আমার তো কানাকড়ি সম্বল নেই, মেয়েটাকে পার করি কি ক'রে ?"

রজনী বিজয়কে অন্তরের সহিতই স্নেহ করিতেন, এ' বিদ্রূপে অপ্রতিভ হইয়া বহিলেন, "তা বিয়ে তো আজই দিচ্ছ না, সম্বন্ধ কোথাও এসেছে না কি ?" বিজয় কহিলেন, "ক'রলেই যে না আসে তাতো নয়, কিন্তু আগে পয়সার জোগাড় না ক'রে সম্বন্ধ করি কোন্ মুখে ?"

সনৎ দাতে চিবাইয়া কহিলেন, "আরে ভয় কি, অদৃষ্টে থাকে, মেয়ের বর আপনা হ'তেই ঘরে ব'সেই জুটে যাবে, কি বল বিজয় ?"

যামিনী কহিলেন, "ঐ গুলো অহাস্ক গোড়ামী। অদৃষ্টকে স্বীকার ক'রে কাপুরুষের মতন নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে হবে, তার মানে কি ? পুরুষকারকে একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে—সেটা কি কিছু বাহাদুরী হ'ল ?"

বিজয় হো—হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "উল্টা বুঝিলি রাম" আমি পুরুষকারকে গলা টিপে মারতে কি ফাঁসী দিতে—এ রকম কিছুই বলিনি। কাজ আমাদের যার যা ক'রবার তা ক'রতেই হবে, না ক'রে আমি থাকতেও পারব না। তবে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল যদি না পাই, তাতে মুগ্ধ হওয়াটা উচিৎ নয়; যেহেতু তখন জানতে হবে—সেইটেই আমার অদৃষ্ট।"

সনৎ কহিলেন, "ঐখানেই তোমার মস্ত বড় ভুল। তুমি যে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ভগবানের বিরাট শক্তিকেই অস্বীকার ক'রছ। তোমার যত বড় বিপদই হোক্, সে সময়ে তুমি যদি ভগবানকে প্রাণ ভ'রে ডাক, তিনি কি তোমায় উদ্ধার ক'রবেন

না? নিশ্চয়ই ক'রবেন। ভক্তের ডাক শুনে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারেন না। পুরাণ, মহাভারতে কি এর শত শত উদাহরণ পাও না? তুমি না হিন্দু সন্তান?" সনতের বলিবার ভঙ্গীতে, গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, বিজয়ের উত্তর শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলেন. বিজয় ধীরভাবে কহিলেন, "দেখ! আমার কথা তোমাদের আমি ঘাড় পেতে স্বীকার ক'রে নিতে বল্‌ছি না, আমার নিজের ব্যক্তিগত মনের ভাব জানাচ্ছি মাত্র; রুচিভেদ বা নিজের নিজের একটা ধারণা বা মত্ মানুষ মাত্রেরই আছে, সেটা মানুষের দোষ নয়! মানুষের যে স্রষ্টা—তাঁরই দোষ বা গুণ ব'লে মেনে নিতে হবে। আমার মনে হয় মানুষের জীবন একটা নাটকের মত। এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দিনের পর দিন তার অভিনয় হচ্ছে। নাটক-কার যেমন একখানি করুণ-রসোদ্দীপক নাটক লিখেছেন, অভিনয় হচ্চে। দর্শকদের সঙ্গে—মনে ক'রে নাও নাটক-কারও ব'সে দর্শক হয়ে দেখছেন। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় হয়ে গেছে, দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উৎকণ্ঠার সহিত ভাবছে, "আহা এ রকম যদি আর না হয়!" অভিনীত চরিত্র গুলির কষ্টের ব্যাপার দেখে মনে ক'রছে, "এইবার বোধ হয় চরম হয়েছে, এর চাইতে আর দুঃখ কষ্ট কি হ'তে পারে?"—ইত্যাদি। কিন্তু নাটক কার নীরবে ব'সে শুধু সে অভিনয় দেখ্‌ছেন, তিনি জানেন—যা তিনি লিখে শেষ করেছেন, ঠিক সেই মত অভিনয় হয়ে যাবেই, কারও ইচ্ছে মত একটুও বদ্‌লাবে না। এমন কি তিনিও যদি সে করুণ দৃশ্যে বিচলিত হয়ে কিছু পরিবর্ত্তন বাসনা করেন, তাও তাঁর তখন সাধ্যের অতীত।"

সনৎ কহিলেন, "এইখানেই তুমি মস্ত বড় ভুল ক'রছ। তুমি তোমার ঘরের জালার জল-মাপা কলসী দিয়ে সমুদ্রের জল মাপ্‌তে চাইছ, এ যে ভয়ানক ধৃষ্টতা।" বিজয় সে কথা কানে না তুলিয়া কহিলেন, "তাঁর শক্তির পরিমাণ আমি করছি না, তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকারও করছি না, কিন্তু তিনি যে নিজের অনন্ত শক্তি, অপরিমিত ক্ষমতাকে এক অলঙ্ঘ্য নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলেছেন, সেইটেই আমার বিশ্বাস। সে শৃঙ্খল তিনি নিজেই নিজের পায়ে পরেছেন। সে বাঁধন তিনি কাটতে পারেন না, বা চান না—এই আমার ধারণা। জগন্নাথ দেবের হস্ত-পদ হীন মূর্ত্তি ও আর যে কিছু ব্যাখ্যাই তোমরা দাও, আমি কিন্তু ঐ বিফল মূর্ত্তিতে ঐ রকমই ইঙ্গিত পাই, আমার মনে হয়—ঐ মূর্ত্তিতেই সূচনা হচ্চে যে তিনি তোমাদের সহস্র মাথা খোঁড়া-খুঁড়িতে, হাজার কাকুতি-মিনতিতে নিজের নিয়মের বাইরে এক চুল কিছু ক'রবেন না। তা ক'রতে তিনি অপারক। এই দেখ না কেন, এই যে পৃথিবীতে ছয় ঋতুর নিয়মিত যাওয়া-আসা, চন্দ্র-সূর্য্যের নিয়মিত উদয়-অস্ত যাওয়া, মানুষের জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এর কি কিছু ব্যতিক্রম কোন দিন হওয়া সম্ভব? জলের শৈত্যগুণ অগ্নির দাহিকা-শক্তি কিছুর কি কোনদিন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে? ফুলের সুঘ্রাণ বা সৌন্দর্য্য, আমের মিষ্টত্ব, নিমের তিক্তস্বাদ, তেঁতুলের অম্লরস কোনও দিন কিছু বদ্‌লাবে মনে কর? আমগাছে কাঁঠাল, লিচুগাছে কালজাম, ডুমুরগাছে হর্ত্তুকী, নিমগাছে পেয়ারা ফলবার কল্পনা কি কখনও ক'রতে পার? কেন পার না? বৈজ্ঞানিকের অণু-পরমাণু তত্ত্ব যত কিছুই বিশ্লেষণ ক'রচ, এখানে তার শক্তি পরাভব। ভগবানের অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁর

সৃষ্টিরাজ্য বাঁধা, এখানে দন্তস্ফুট ক'রবার সাধ্য কারও নেই।”

কেহ কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই “আয় খোকা বাড়ী যাই” বলিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য সতীশও আজ পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল, নিমগাছে পেয়ারা ফলিবার কথায় তার মনটা অত্যন্ত প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু উক্ত ফলটি তাহার বিশেষ প্রিয় এবং তাহাদের বাড়ীর আঙিনায় একটি বিশালকায় নিমগাছ বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া বহুকাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে। সে গাছটির শাখায় শাখায় যদি পেয়ারা ফল ধরে—কি মধুর, কি চমৎকার সে কল্পনা। সতীশ পথে যাইতে যাইতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল, “নিমগাছে পেয়ারা কখনও হয় না, হ'তে পারে না, না—বাবা?” বালক সে মধুময় কল্পনাটিকে জোর করিয়া মনের মধ্যে আর অধিক আমল না দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

৯

বিজয় পত্নী ও পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে ট্রেনে চাপিয়া চন্দন-নগর রওনা হইতেছেন। তাঁহার বড় শ্যালীর একমাত্র কন্যাটির বিবাহ, সে জন্য তিনি ভগ্নীপতিকে যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, সারদা আট-ন বৎসর সেদিকে যান নাই, এতদিনের পর ভগ্নীর সাদর আহ্বান আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বিশেষ করিয়া বরদা যখন পথ খরচের টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। অগত্যা বিজয় না যাইয়া পারিলেন না। ছেলে-মেয়ে দুইটা মাসীর বাড়ী যাইবার নামে খাওয়া পড়া ভুলিয়া তল্পী-তল্পা

বাঁধিতে বসিয়া গিয়াছে, সতীশ একটি কাগজের বাক্সতে কতকগুলা সিগারেটের ছবি, একটা বাঁশী, লাট্টু ও তাহার সুতা, গোটাকতক গুলি ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিল। কে জানে তাড়াতাড়ির সময় যদি এ নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলার এক-আধটা লইতে ভুল-ই হইয়া যায়। পুঁটিও নিজের ভাঙা একটি টিনের বাক্সতে কতক গুছাইয়া লইল, ননীর সহিত যে পুতুলের বিবাহ দিয়াছিল, সেটিকে লইয়া আসিল, কি জানি, যদি মাসীর বাড়ী হইতে ফিরিতে দেরী হয়, পুতুল-মেয়ে, মায়ের জন্য কান্নাহাটি করিবে তো? গোটাকতক ঘুঁটি, পুঁটি বাছিয়া সংগ্রহ করিল, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, ননী (মাসীর মেয়ে) কি এ সব ছেলেমানুষী আর পসন্দ করিবে! তাহার বিয়ে হইতেছে, কত ভাল ভাল গয়না, কত রকম কাপড়-জামা, কত পুতুল-খেলেনা সে এখন পাইবে, পুঁটির এ তুচ্ছ উপহার দেখিয়া কি সে বিদ্রূপ করিবে না?

বরদার অবস্থা ভাল। বাপ-মা কেহই নাই, একটি মাত্র ভাই, কলিকাতায় অল্প বেতনে কোনও অফিসে কাজ করেন, কচিৎ কখনও এক-আধখানা চিঠি পত্র লিখিয়া বোনেদের খোঁজ খবর লইয়া থাকেন। যাহা হউক, বরদা সাধ্য পক্ষে সারদার যথেষ্ট সংবাদাদি লইয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে সারদাকে আসিবার জন্যও লিখিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যান্ত কোনো কিছু একটা উপলক্ষ না থাকায় সারদার যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন বোন্‌-ঝির বিবাহ উপলক্ষে যাইবার সুযোগ জুটিল, চাই কি, সেখানে যাইলে হয় তো পুঁটিরও একটা বর জুটিয়া যাইতে পারে। ভগ্নীর সহিত অনেকদিনের পর দেখা হইবে, সেজন্য সারদার মনটাও খুব খুসী হইল। আহা, যেখানে যত দূরেই থাক্‌, মার পেটের ভাই-বোন্—

যাদের সঙ্গে পৃথিবীতে আসিয়াই পরিচয় হয়, বাপ-মার স্নেহ যাদের সহিত কাড়া-কাড়ি করিয়া উপভোগ করিতে হয়, শৈশবের সোণার দিনগুলি যাদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করিয়া কাটিয়াছে, যে দিনের মর্য্যাদা তাহার উপস্থিতিকাল অপেক্ষা অতীত কালে শতগুণে বাড়িয়া যায়, এবং স্মৃতিটুকু মনের নিভৃত স্থানে এমন সুন্দর রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে—যাহার ছবি, পরিনত জীবনে, সকল প্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আনন্দ দান করে। পৌষ মাসেই ধান কাটা শেষ হইয়াছিল, বিজয় ধান মাপাইয়া গোলায় তুলিয়া, কৃষাণকে খড় গুলি বাঁধিয়া রাখিবার পরামর্শ দিয়া চন্দননগর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জমীতে কিছু তেওড়া-কড়াই বোনা হইয়াছিল, সেগুলি গরুর মুখ হইতে যথাসাধ্য বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও উপদেশ দিলেন, নিতাই হাড়ীকে আর কেহ বিশ্বাস না করিলেও, নিজের ঘর বাড়ী আগুলিয়া শুইবার জন্য তাহাকেই বলিয়া গেলেন।

বাড়ী হইতে ষ্টেশন বেশী দূরে নয়, গরুর গাড়ীতে সারদা ছেলে-মেয়েকে লইয়া উঠিলেন, সতীশ ও পুঁটির আজ আনন্দের সীমা নাই, দু-চক্ষের সাম্‌নে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই আজ তাহাদের মাসার বাড়ী যাইবার খবরটা শুনাইয়া দিতেছে। এতো বড় শুনিবার মত সংবাদটা না শোনাইয়া কি পারা যায়? ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সারদাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া বিজয় পাসের কামরায় উঠিলেন, সারদা মনে মনে দুর্গা নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুঁটি ও সতীশ জানালা হ'তে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতদূর দৃষ্টি চলে—যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে—সেগুলি দেখিয়া লইতে লাগিল, এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সতীশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ মা, কি মজা হয়েছে একবার চেয়ে দেখ" সারদাও মুখ বাড়াইয়া

দেখিলেন, মজাই বটে। কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস! ব্যাপারটি এই,—এক ভদ্রলোক গ্রাম হইতে কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছেন, জমীর চাষের গুড়ের একখানি কলসী লইয়া যাইতেছিলেন, জিনিষ পত্র ও গুড়ের কলসী—চাকরটি গরুর গাড়ী করিয়া পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিল, গাড়ী হইতে কলসীটি নামাইবার সময় বেচারী দেখিল, কলসীটি ফাটিয়া গিয়া পাৎলা গুড় অল্প পরিমাণে পড়িতে সুরু করিয়াছে, সে সাবধানে সেই ভাঙা কলসটি-ই মাথায় লইয়া ষ্টেশনে চলিল, এদিকে নাড়া পাইয়া তখন কলসীটির চারি ধারের ফাটা হইতে রসের ধারা গঙ্গা-যমুনার ধারের মত, ভৃত্যটির মাথা, গা বহিয়া নামিতে লাগিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য অনেকেই উহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল। কেহ সহানুভূতি জানাইল, কেহ উহার বুদ্ধির নিন্দা করিল, গুড়ের মালিক তখন ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন, তিনিও বোকা চাকরটাকে "গাধা, উল্লুক," বলিয়া গালি দিলেন; সে বেচারী একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। মা ঠাকুরাণী গুড়ের কলসীটি খুব সাবধানে ট্রেনে তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, সে ও প্রাণপণে সে'টিকে সমস্ত পথ বাঁচাইয়া আসিতেছে, হঠাৎ কোন্ ফাঁকে সে যে ঠোক্কর খাইয়া ফাটিয়া বসিয়া আছে, তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে? লোকটিকে ভ্যাবা-চ্যাকা দেখিয়া, দু'একজন দুষ্ট খালাসী, তাহার গাত্রবাহী গুড়—আঙ্গুলে লইয়া তাহারই গালে মাখাইয়া দিল, সকলেই মুখ-ব্যাদান করিয়া পরম কৌতুকের সহিত এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছে, আর তাহাদের হি হি হাসির রোলে ষ্টেশন মুখর করিয়া তুলিয়াছে; দেখিয়া সারদার বড় রাগ হইল। লোকগুলার কি আক্কেল? একটা ভালমানুষকে নাকালে পড়িতে দেখিয়া রঙ তামাসার ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছে!

নিতাই বৌ-ঠাকুরুণকে ট্রেণে চাপাইতে আসিয়াছিল, সে লোকটির মাথা হইতে কলসীটি নামাইয়া, নিকটে খাবারের দোকান হইতে ঝাঁ করিয়া একটি হাঁড়ী আনিয়া গুড়টুকু তা'তে ঢালিয়া ফেলিল। অনেকটা গুড় নষ্ট হইলেও অর্দ্ধেকটাও বাঁচিয়া গেল এবং যে বেচারী এতক্ষণ সকলের রঙ্গ তামাসার পাত্র হইয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল; সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মা-ঠাকুরুণের কাছে তো তবু যা'হোক কিছু মুখ রক্ষা হইবে! নিতাইকে কিছু দু'টা ভাল কথা বলিবার পূর্ব্বেই ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় মিলিয়া গেল। সারদা লোকটীর একটা পরিত্রাণ ঘটিল দেখিয়া স্বস্তি বোধ করিলেন, নিতাইএর প্রতি তাহার মনটা খুব খুসী হইয়া উঠিল।

১০

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অর্দ্ধেক কুটুম্ব বিদায় হইয়া গিয়াছেন, তবে এখনো দূরের দু'চারি জন রহিয়াছে। সারদা বাড়ী ফিরিবার জন্য ততো ব্যস্ত না হইলেও বিজয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শ্যালী-শ্যালাদের কবল হইতে সহজে নিষ্কৃতি নাই, পাইবার চেষ্টাও বৃথা, সময় হইলে আপনিই ছাড়িয়া দিবে—এই ভাবিয়া চুপ-চাপ আছেন। আর সারদাও তো বারমাস খাটিয়া খাটিয়াই মরে, দিনকতক আরও দিদির আদর যত্ন সাধ মিটাইয়া উপভোগ করুক।

দুপুর বেলা বরদা বসিয়া বৈকালের তরকারীর জন্য কুটনা কুটিতেছেন, সামনের প্রশস্ত দালানে বরদার মাসতুত' ভগ্নী ইন্দু, সারদা, বাড়ীর মেজ-বৌ ও ন-বৌ বসিয়া গ্রাবু খেলিতেছে,

কাছে বসিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে গুলা পিটের কাগজ কুড়াই-তেছে, কাড়াকাড়ি করিতে গিয়া এক পক্ষের পিট, প্রতি পক্ষের পিটের সহিত কখনও বা মিলাইয়া ফেলিতেছে। কেহ বা সাধের পাঞ্জা খানা পর্য্যন্ত পিটের সহিত গুটাইতে গিয়া মাতৃমুখ হইতে "হতভাগা পোড়ারমুখো" প্রভৃতি মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিতেছে, দু'একটা কিল চাপড়ও যে লাভ না হইতেছে তা নয়, তবু কি অবোধ জীব গুলার লজ্জা আছে ছাই! এই সময় গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বিজয় আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বরদা কহিলেন, "কি ভাই, অসময়ে যে! খাবার সময়টি ছাড়া তো তোমার টিকিটি দেখ্‌তে পাবার জো নেই।"

বিজয় কহিলেন, "ঠাকুর-ঝি প্রকারান্তরে আমায় পেটুক বল্‌ছেন, বলুন তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু পেটুককে পরিতোষ ক'রে খাওয়ালে পুণ্য আছে—একথা বোধ হয় আপনাদের জানা নেই।"

সারদা কহিলেন, "মুখের কাছে কেউ টিঁকবে না দিদি, কথার জোরে খুব জিত্‌তে পারেন।" বধূ দু'টি ঠাকুর-জামাইকে দেখিয়া নাকের উপর পর্য্যন্ত কাপড় টানিয়া দিয়াছিল, ন-বৌ সারদার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "ছোট্ ঠাকুর-ঝি! শুনেছি ঠাকুর-জামাই নাকি খুব গাইতে পারেন, একটা গান গাইতে বলুন না!"

সারদা কহিলেন, "তোদের শুন্‌তে সাধ থাকে, তোরা বল, আমার শুনে শুনে অরুচি হয়ে গেছে।"

বিজয় কহিলেন, "শুন্‌ছেন ঠাকুর-ঝি তেজের কথা? অমৃতে কি কখনও কা'রও অরুচি হয়?"

ইন্দু কহিল, "তাই বটে বিজয় বাবু, দিদির খুব বরাত ভাল

তাই দিন রাত্তির গান শুনতে পান। এখন বৌ-ঠাক্‌রুণদের আরজি শুনে, দুটো গান আপনি শুনিয়ে দিন।”

বিজয় কহিলেন, “বউঠাক্‌রুণদের অনুরোধে আমি গান গাইব, আর ঘরগুষ্টি সবাই তোমরা শুনে নেবে, সে হবে না। আমি গাইব মনে মনে—ওঁরা শুনবেন কাণে কাণে। বরদা কহিলেন, “বাদ রাখ, একটা ভাল দেখে গান গাও দেখি, অনেকদিন তোমার গান শুনিনি, তখন তো গাইবার জন্যে সাধতেও হ'তো না, নিজের মনেই চব্বিশ ঘণ্টা গান গাইতে।”

বিজয় কহিলেন, “খোদ মালিকের হুকুম অমান্য ক'রতে পারি না। এখন ইন্দু ঠাকুর-ঝি চট্ ক'রে দু'টো পান দিয়ে বায়না ক'রে ফেল দেখি! ইন্দু পান আনিয়া দিল, বিজয় পান চিবাইতে চিবাইতে সুর ভাজিতে লাগিলেন। সারদা কহিলেন, “তবে তোদের তাস খেলা এখন রেখে দে, গান শুন্‌বি—না তাস খেল্‌বি, আমি একটু ওবাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি।”

বিজয় কহিলেন, “দেখছেন ঠাকুর-ঝি! সাক্ষাতে আমার এতখানি কদর দেখেও ও আমার দর বুঝতে পারলে না।” সারদা চলিয়া গেলেন। বধূরা ইন্দুর কানের কাছে কেউ 'রবী বাবুর' কেউ 'রজনীবাবুর' গানের ফরমাস করিল, বিজয় ফরমাস শুনিবার আগেই গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

“তোমারি আশে ব'সে আছি ব'লে,
তাই বুঝি দেখা দিলে না দিলে না।”

মধুর উচ্চকণ্ঠ অনেকদূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল, সে সুমিষ্ট স্বরে আকৃষ্ট হইয়া ছেলে-বুড়া অনেকেই গায়ককে দেখিবার ও গান ভাল করিয়া শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। সৌদামিনীর

বাড়ী, বরদার বাড়ীরই সংলগ্ন। তিনি তখন আহারান্তে দিবা-নিদ্রা উপভোগের চেষ্টা করিতেছিলেন, একমাত্র পুত্র শচীন্দ্র কয়দিন অসুস্থ হইয়া কলেজ কামাই করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে, আজ একটু ভাল আছে, অমনি মাতার নিষেধ সত্ত্বেও মাথার উপর রৌদ্র লইয়া, জলের ধারে বসিয়া ঠাণ্ডা লাগাইয়া মাছ ধরিতে গিয়াছে; সেজন্য তাঁহার স্নেহকাতর চিত্ত উতলা হইয়া রহিয়াছে, শয্যায় শুইয়াও ঘুমাইতে পারিতেছেন না। পুত্রের 'মা' আহ্বান শুনিবার আশায় কাণ পাতিয়া আছেন, এমন সময়ে বিজয়ের সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' অর্দ্ধসুপ্ত স্মৃতিটিকে সবলে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিল, চমকিয়া সৌদামিনী শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন।—এ কি ঘুম-ঘোর, না জাগরণ! না—না, ঘুম কিসের? স্বপ্নই বা কেন হইবে? তিনি তো সহজ শরীরে জাগ্রত অবস্থাতেই এ গান শুনিতে পাইতেছেন। আজ চারি বৎসর মাত্র এ গান শোনা তাঁহার বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রিয়তম স্বর্গীয় পতি দেবতা অত্যন্ত অনুরাগের সহিত এই গানটি যখন তখন গাহিতেন, এই সঙ্গীতটি তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল, যদিও তাঁর কণ্ঠ-বীণা এ গৃহ মন্দিরে চিরদিবসের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার রেষ অভাগিনী বিধবার কানে দিন-রাত্রিই অশ্রান্ত ভাবে বাজিতেছে, এখন যে তাঁহারই ক্ষুধিত তৃষিত বিরহ কাতর অন্তরাত্মা আপন মনে সকরুণ স্বরে বারবার গাহিতেছে, "তোমারই আশে ব'সে আছি ব'লে, তাই বুঝি দেখা দিলে না দিলে না" শ্রীকরুণ উপাস্যের নিকট একান্ত অনুরক্তা, চিরনির্ভরশীলা উপাসিকার প্রাণস্পর্শী অনুযোগ। ওগো! যিনি একদিন অতি নিকটে অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সমভাবেই সংলগ্ন হইয়া-

ছিলেন, আজ তিনি কোথায়? আজ দুইজনের মধ্যে কতখানি ব্যবধান! কত অফুরন্ত সময়—বিরাট কায় অজগর সর্পের মত উভয়ের মিলন পথে বুক জুড়িয়া পড়িয়া আছে।

জীবন তো চক্ষে দেখিতেছি, তারপর মৃত্যু! অতি ধ্রুব—অতি সহজভাবে সে একদিন নামিয়া আসিবেই। তারপর? জগতের কত জ্ঞানী, কত মহাত্মা, কত চিন্তাশীল, কত দার্শনিক কত ভাবে, কত রূপে তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তবু সে তত্ত্ব চির-রহস্যপূর্ণ—সে সমস্যা, চির-জটিলতাময়।

নারীর পরম প্রিয় পরমোপাস্য পতিদেবতা—যাঁহার চিন্তায়, যাঁহার ধ্যানেই তন্ময় হইয়া রমণী এ কঠোর বৈধব্য জীবন পরম ধৈর্য্যের সহিত কাটাইতে পারিতেছেন, এ জীবন অন্তে আবার কি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? একদিন কি এ অনুরাগ-পথ চেয়ে থাকার অবসান ও সার্থকতা আসিবে? আসিবে বইকি! আর যে কেহ যে ভাবেই জীবনান্তের যে কোন অবস্থা কল্পনা করুক না কেন, হিন্দু রমণীর—মৃত স্বামীর সহিত পুনর্মিলনই চরম ও পরম ঈপ্সিত কামনা। কে বলে গো, এ প্রাণপণ কামনার সার্থকতা নাই? সৌদামিনী, স্বামীর মৃত্যু-শয্যায় উপদেশ বাণী স্মরণ করিয়া শরীরে ও মনে দ্বিগুণ বল সঞ্চয় করিতেন। যখন তিনি বিবশার ন্যায় কাঁদিয়া অনন্তধাম যাত্রী পতির পায়ের উপর লুটাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমায় কেন একলা ফেলে রেখে যাচ্ছ, সঙ্গে নিয়ে চল গো, বাপের বাড়ী যাবার জন্যে এক বেলার ছুটী দিতে চাইতে না, একদিনের তরে চোখের আড়াল ক'রতে না, আর আজ পাষাণে বুক বেঁধে, যুগ-যুগান্তরের ছুটি দিয়ে কোথায় যাচ্ছ গো, এ কঠিন শাস্তি যে আমি সইতে পারবো না।"

ব্রজসুন্দর ধীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমার কথা শোনো, কাতর হ'য়ো না। শচানকে এখন মানুষ ক'রতে হবে, তোমার হাতে তার ভার দিয়ে দিলুম। মায়ের কাজ বাকী রেখে এখন কোথায় যেতে চাও? একদিন তো যেতে হবেই।"

সৌদামিনী কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "মায়ের কার্য্যের বিষয় তো মাকে বেশ শিক্ষা দিলে। আর, তুমি নিষ্ঠুর!—পিতার কর্ত্তব্য বাকী রেখে চলে যাচ্ছ কেন? এ 'কেন'র উত্তর কই? এ 'কেন'র মীমাংসা কে করিবে? মৃত্যু-পথ-যাত্রীর দুই চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "এ সোণার সংসার, এ প্রাণের সন্তান, এমন মনের মতন স্ত্রী, একি কেউ সাধ ক'রে ছেড়ে যেতে চায়? কিন্তু ওগো! আমার যে ডাক এসেছে, এ ডাক ফেরাবার সাধ্য কি মানুষের?" স্বামীকে কাতর দেখিয়া সাধ্বী তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অক্ষয় অশ্রু ভাণ্ডার গোপনে সঞ্চিত রাখিয়া, স্বামীর বিশুষ্ক ললাট চুম্বন করিয়া স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "তাই তুমি যাও, আমার জন্যে পথ চেয়ে থেকো, আমার কাজ শেষ্ হ'লেই আমায় ডেকে নিও, আবার আমরা দু'জনে সেথায় মিল্‌বো।"

প্রচুর ধনসম্পত্তি, নাবালক পুত্র, আত্মীয়স্বজনহীন পত্নী রাখিয়া ব্রজসুন্দর কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করিলেন।

পতিহীনা, বিধবার ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি অনেকেরই লুব্ধ শ্যেন-দৃষ্টি পতিত হইল, অনেকেই বিষয় রক্ষা করিবার জন্য উপযাচক হইয়া বিলি ব্যবস্থা করিতে সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হইলেন। সৌদামিনী মিষ্ট কথায় সকলকেই আপ্যায়িত করিলেন, কিন্তু কাহারও সাহায্য লইলেন না, সরকার মহেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ

করিয়া বিষয় কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, পুত্রেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পরে সকলেই বুঝিলেন, এ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালিনী নারীর নিকটে কাহারও দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই, ইহার কূট-বুদ্ধির নিকট সকলেরই চাতুরী ব্যর্থ হইবে। খুব হিসাব করিয়া সৌদামিনী খরচ পত্র করিতেন, অথচ দেশের অভাব গ্রস্থ ও দীন দুঃখীর তিনিই মা বাপ। আর শচীন্দ্র—অমন মাতৃ-বৎসল সুবুদ্ধি সন্তান যদি সকলের গৃহে থাকিত, সে গৃহ আনন্দ নিকেতন হইত। শচীন্দ্রের মুখ চাহিয়া সৌদামিনী সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা হাহাকার মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিত। তাঁ'র বড় আদরের একমাত্র পুত্র শচীন্দ্র দ্বিতীয় যে যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্দ্ধমান রাজবৃত্তি পাইল, সে যে এই বয়সেই কত বিনয়ী, শরীরে তার কত দয়া, তিনি তো কিছুই দেখিলেন না! বড় সাধে যে বৃক্ষের চারাটিকে লালন পালন করিতেছিলেন, আজ তাহা মহা-মহীরূহে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এ যে তিনি দেখিলেন না,—এ বেদনা কাঁটার মতন সৌদামিনীর বুকে বড় বাজিত।

১১

"মাসী-মা মাছ নিন্।" ডাক শুনিয়া চিন্তাসাগর নিমগ্না সৌদামিনীর চমক হইল। চাহিয়া দেখিলেন,—পুঁটি কোমরে কাপড় জড়াইয়া, পায়ের দিকের কাপড় খানিকটা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া, একটা সের-দেড়েক রুইমাছ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সৌদামিনী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, শচীন্দ্র মাছ ধরিতেছে,

পুঁটিকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপড় ভিজুলি কি ক'রে মা? পুকুরে নেমেছিলি বুঝি? নূতন জায়গার জল এই শীতের দিনে বেশী ঘাঁটিস্ না বাছা, নিজেও ভুগ্‌বি, বাপ-মাকেও ভোগাবি।"

পুঁটি কহিল, "শচী-দার মাছ, বঁড়শী খুলে পালিয়েছিল আর কি; আমি জলে নেমে চেপে ধরে ফেলেছি।"

সৌদামিনী কহিলেন, "তাকে বল্ গো মা, আর যেন মাছ না ধরে। একটা তো ধরেছে, এই ঢের। কে খাবে অতো মাছ? ভারী মাছধরা বাতিক তার।"

পুঁটি, মাতার নিষেধ আজ্ঞা—পুত্রকে একটু অতিরঞ্জিতভাবে শুনাইবার প্রলোভনটুকু সম্বরণ করিতে পারিল না। পিঠের উপর খোলা চুলগুলি নাচাইতে নাচাইতে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে সৌদামিনী আবার ডাকিলেন, "মা পুঁটু! তোমাদের বাড়ী কে গান ক'র্‌ছেন?" "বাবা" বলিয়াই পুঁটি ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সৌদামিনীর মনে হইল, পুঁটি মেয়েটি মন্দ নয়, সারদাকেও তিনি ছোটবেলায় দেখিয়াছেন, সারদা তাঁহার অপেক্ষা কয়বৎসরের ছোট, পুঁটি বয়সকালে মাতার মতই শান্ত ও সুবুদ্ধি মেয়ে হইবে। পুঁটির রঙ ফর্সা নয়, কিন্তু মুখের শ্রী ও সর্ব্বাঙ্গের ডৌলটি বেশ সুকুমার। পুঁটিকে বউ করিলে কেমন হয়? তাঁহার কন্যা নাই ছোট্ট মেয়েকে বধূ করিয়া কন্যার সাধও মিটিবে।

কিন্তু সৌদামিনী নিজের মনে এ প্রস্তাব করিয়া নিজেই মুখ টিপিয়া হাসিলেন, যেহেতু তাঁহার এ অদ্ভুত বধূ নির্ব্বাচনের কাহিনী যে শুনিবে, সেই যে তাঁহাকে ছি ছি করিবে। কারণ শচীন্দ্র

দুইটা পাশ করিয়া আর একটি পাশের পড়া পড়িতেছে। তাহাকে কন্যা দিবার জন্য কত রূপসী-কন্যার ধনবান পিতা আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন, বার্ষিক বার হাজার টাকার মুনাফার একমাত্র উত্তরাধিকারী সে, তার উপর নিজে সে সচ্চরিত্র বিদ্বান, সুকান্তি-সম্পন্ন যুবা। দরিদ্র পিতার কালো মেয়েকে সে কোন দুঃখে বিবাহ করিবে! লোকেই বা তাহা হইলে সৌদামিনীকে বলিবে কি? কিন্তু লোকের বলা?—মুহূর্ত্তে সৌদামিনীর ললাট কুঞ্চিত হইল, সে জিনিষকে তিনি ভয় না করিয়া চলিতেই বরাবর অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি যদি নিজের পছন্দতে পুত্রের বিবাহ দেন, তাহাতে লোকের বলাবলি আবার কি? দারিদ্রের সহিত ধনীর কুটুম্বিতা কি এমনি হাস্যকর ব্যাপার? কিন্তু, কিন্তু শচীনের বিবাহের কথায় আজ কি কথা মনে পড়িয়া গেল; সৌদামিনী শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কতদিনের পুরাতন স্মৃতি বায়স্কোপের ছবির মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

সে আজ দু'তিন যুগের কথা, কোন্নগরে তাঁহার বাপের বাড়ী ছিল—হায়! কোথায় আজ সে ধূলা-খেলার দিন! মা, পিসিমা ও পাড়ার অন্যান্য রমণীরা বৈকালে গা হাত ধুইয়া কলসীতে গঙ্গাজল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, সঙ্গিনীদের সহিত সৌদামিনী গঙ্গা-মৃত্তিকা লইয়া প্রদীপ ও পুতুল গড়িতে ব্যস্ত, মাতার আহ্বান তাঁহাদের কাণে স্থান পাইল না। সূর্য্যদেব তখন পশ্চিম গগণে হেলিয়াছেন, তাঁর শান্ত কিরণ জাল শরতের ধান্যক্ষেত্রে কাঁচা সোণার রং ফলাইয়াছে, আকাশের বুকে পেঁজা তুলার মত খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ-গুলিতে সোনালী, গোলাপী ও বেগুণে রঙের ছোপ ধরিয়াছে,

গঙ্গার বুকে ছোট বড় কত নৌকা পাল তুলিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে দু'একখানা ষ্টিমার উৎকণ্ঠ বাঁশীর শব্দে, আসন্ন সন্ধ্যার প্রশান্ততাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিজয়-গর্ব্বে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে, তাহার গতি সঞ্চালিত ঢেউ গুলা পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া, যেন ঘাটে আসিয়া ছোট ছোট মেয়েগুলির পায়ের কাছে আছাড়িয়া পড়িয়া বেদনা জানাইতেছে, এমন সময়ে এক গৈরিকধারী রুদ্রাক্ষ-মণ্ডিত, ভস্ম-ভূষিত সন্ন্যাসী লোটা ও চিমটা হাতে লইয়া ঘাটে আসিলেন; বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "খোঁকী-লোগের কি হচ্ছে ?"

মেয়েদের মধ্যে বুড়ি খুব সাহসী ছিল, সাধু সন্ন্যাসীর ঝোলায় ধরা পড়িবার ভয় তাহার আদৌ ছিল না, বরং সাধুদের দেখিলেই তাহার হাত দেখাইতে বড় মজা লাগিত, সে কহিল, "সাধুবাজ তুমি হাত গুণতে জান ?"

সাধু কহিলেন, "কেন খোঁকী, কি দেখতে হবে ?" "তোর বিয়ে কবে হবে, তাই জানবি ?"

তৎক্ষণে বুড়িকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া মেয়েদের দল সাধুর আশে পাশে সুদূর ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিবার আশায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধু বুড়ির হাতখানি দেখিয়া কহিলেন, "বিয়ে তোর কিছু দেরী হবে খোঁকী, আউর, তোর তো বুড়া দুলাহা হোবে।" বুড়ি লজ্জিত হইয়া কহিল, "ধ্যেৎ, আমার পয়সা কত হবে, তাই বলে দাও।" বাঙ্গালার ঘরের মেয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইতে না হইতেই বর নামটির সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, ঠাকু-মা দিদিমা হইতে মাসী, পিসি, দিদি, খুড়ী প্রভৃতি সকলেই তাহাকে তাহার ভাবী বরটির সম্বন্ধে সুকথা, কুকথা অনেকেই

বলিয়া থাকেন, এ হেন বর জিনিষটির সম্বন্ধে মুখে লজ্জিত হইলেও, বিশেষ করিয়া কিছু জানিবার আগ্রহ সব মেয়েরই হইয়া থাকে, সুতরাং মেয়ের দল পরম কৌতুক ও উৎসাহের সহিত, নিজ নিজ বর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিবার জন্য সাধুর কাছে হাত পাতিয়া দেখাইতে লাগিল। সাধু কাহাকেও সুন্দর যুবা বর, কাহারও কালো, কাহারও বুড়া ইত্যাদি নানা কম বলিল, কাহাকে বলিল, দশ ছেলের মা হইবে, কাহাকে বলিল, বন্ধ্যা হইবে, কাহকে বলিল, দুটি মাত্র কন্যা হইবে, পুত্র হইবে না, ইত্যাদি। ধন ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধেও কাহাকে ধনীর গৃহিণী, কাহাকে জজের, কাহাকে কেরাণীর, কাহাকে গরীব গৃহস্থের গৃহিণী পদ দিলেন, সৌদামিনী এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, সাধু তাহার ছোট হাতখানি টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তুই হাত দেখাবি না খোঁকী? তোর তো নসীব ভারী ভাল আছে, বড় সুন্দর দুলাহা পাবি।" সৌদামিনী লাজ-রক্ত মুখে কহিলেন, "আমার ক'টা ছেলে হবে, দেখতো সাধু বাবা!" হাতের দিকে দেখিতে দেখিতে সাধুর ললাট কুঞ্চিত হইল, তার পর হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোর ছেলে তো একটি হবে খোঁকী, বাকী তোর ছেলেকে বিয়ের রাতে সাঁপ কাটিয়ে মারবে—এই তোর নসীবের লেখা" মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহাদের মাতৃস্নেহ তখন পুতুল-পুত্র কন্যাতেই সীমা বদ্ধ, সে স্নেহের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, পুত্র-কন্যার অমঙ্গল চিন্তায় বিত্রস্ত-বিক্ষুব্ধ হইবার বয়স তখন হয় নাই, মেয়েরা বাড়ী আসিয়া সকলের নিকট এ—উহার অদৃষ্ট গণনার ফলাফল বর্ণনা করিল, গাঁজাখোর সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া দিনকতক খুব একটা রহস্য চলিল, তার পর সে আন্দোলন কোথায় ডুবিয়া

গেল। ভবিষ্যদ্‌জীবনে কোনও কোন মেয়ে হয় তো সে বাণী মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, তার কতটুকু সত্য—কতটুকু মিথ্যা ; কিন্তু সঙ্গিনী মহলে সকলে মিলিয়া সাক্ষ্য দিয়া সে সত্য মিথ্যার যাচাই করিবার সুযোগ আর তাহাদের ঘটিয়া উঠে নাই।

বিবাহের পর বহুদিন পর্য্যন্ত যখন সৌদামিনীর কোনও সন্তানাদি হইল না ; এত ধনসম্পত্তি স্বত্তেও একটি মাত্র পুত্র বা কন্যা না হওয়ায় ব্রজসুন্দর যখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেন—সৌদামিনীর ললাটে মেঘান্ধকার ঘনাইয়া আসিত। শ্বাশুড়ী থাকিলে নিশ্চয়ই পুত্রের আবার বিবাহ দিতেন, সৌদামিনী সাহসে বুক বাঁধিয়া স্বামীর নিকটে নিজের বন্ধ্যাত্ব উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, ব্রজসুন্দর সম্মত হন্‌ নাই। সৌদামিনী একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামীর নিকটে তাঁহার ছোট বেলাকার হাত দেখানের কথা বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী যে তাঁহাকে পরম সুন্দর, প্রেমময় পতি লাভের কথা বলিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে পুত্রের বাসর গৃহে সর্পাঘাত কাহিনী।—ব্রজসুন্দর শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "মাথা নেই, তার আবার মাথা ব্যথা" সৌদামিনা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আর কখনও স্বামীর নিকটে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই।"

তার পর যখন কালক্রমে দেবতার করুণায় তরুণ শিশুর মধুর হাসি, পিতা-মাতার মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া দিয়া, স্নেহের নবারুণ-রাগে রাঙাইয়া তুলিল, বৃহৎ জমিদার ভবন বহুকাল পরে নব শিশুর হাস্য ক্রন্দনে মুখরিত হইয়া উঠিল, চারিদিকে দাস দাসীগণের ব্যস্ততা পড়িয়া গেল, সেই সময় আবার একদিন স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া সৌদামিনী ছল্‌ ছল্‌ নেত্রে, স্নেহাশীষ চিত্তে সেই

বিভীষীকাময়ী ভবিষ্যদ্বাণী জানাইল—ব্রজসুন্দর গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "ভগবানের করুণায় অবিশ্বাসী হও কেন? তাঁর দান মাথা পেতে নিয়ে ধন্য হও। তাঁর জিনিষ তিনিই রক্ষা করবেন, তাঁর করুণার উপর শুধু নির্ভর ক'রে থাকো এর বেশী কিছু চাইলেই অশান্তি। নিজের কাজ করে যাও, তা হোলেই জীবনের গতি সহজ হবে, সুন্দর হবে। দেওয়া-নেওয়া তাঁরই হাত। মানুষের হাকু-পাকু করাই ধৃষ্টতা।" সৌদামিনী সেইদিন হইতে মনে প্রাণে বল সঞ্চয় করিয়া এ দুশ্চিন্তা ভুলিতে চেষ্টা করিল, ক্রমে ভুলিয়াও গেল। কিন্তু তবুও ক্বচিৎ কখনও এ দুর্ভাবনা, তাঁহার সমাধি-শয্যা হইতে উঠিয়া প্রেত-ছায়ার মত তাঁহার মনের কোণে যেন উঁকি দিয়া চাহিত।

সৌদামিনী স্বামীর উপদেশ বাণী সসম্ভ্রমে স্মরণ করিলেন, ইষ্ট-দেবতার উদ্দেশে যুক্ত-করে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তোমার করুণায়, তোমার বিধানে সন্দেহ কোরে মহাপাপ করছি প্রভু, দুর্ব্বল মাতৃ-স্নেহকে ক্ষমা কর দেব!"

আর ওগো তুমি, আমার ইহ-পরকালের দেবতা, আজ তুমি যেখানেই থাক, চেয়ে দেখ, তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করছি কি না। একদিন যে কাজের ভার মাথায় তুলে দিয়ে গেছ, সে ভার যথা সময়ে নামিয়ে তোমারই পায়ের কাছে তার ভাল রকম জবাব-দিহি দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে যাব, তুমি আমার আশা পথ চেয়ে থাক গো, তোমার অনন্ত প্রেমের বাঁধন-ডুরি দিয়ে আমায় এম্নি ক'রে চিরদিন টান্তে থাক, তা হ'লেই আমার দুঃখ কষ্ট সব সার্থক হবে গো।"

১২

সৌদামিনী যখন সারদাকে—তাঁহার পুঁটির বিবাহের কিরূপ সম্বন্ধ হইতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া, সারদার নিকট হইতে সবিস্তারে তাঁহাদের দারিদ্র্যের ও অর্থাভাবে কন্যার বিবাহের উপায় নিতান্ত দুষ্কর,—এ সকল কথা শুনিলেন, তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দু'চার দিন নিজের মনে তোলাপাড়া করিয়া অবশেষে বরদার কাছে শচীন্দ্রের সহিত পুঁটির বিবাহের কথাটা পড়িলেন। বরদা প্রথমে অবাক্ হইয়া গেলেন, তার পর সৌদামিনীকে খুব ধন্য ধন্য করিয়া, খুসী মনে ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে ডাকিয়া সু-খবরটি শোনাইলেন। সারদা প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, মনে করিলেন, বুঝি একটা রহস্য। কিন্তু দিদি কি এ রকম গুরুতর কথা লইয়া তাহার সহিত রহস্য করিতে পারেন? সারদার দুই চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, তিনি গলায় কাপড় দিয়া মা কালীর-উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা মুখ তুলে চাও কালী। আমার পুঁটির বরাতে কি এমন ঘর, বর আছে? তোমার দয়ায় সবই হ'তে পারে মা তারা, ইচ্ছাময়ী তুমি, তোমার ইচ্ছায় কি না হয়!"

কন্যাদায় যে কঠিন, বরদা তাহা সম্প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছেন, ভগ্নীর এ সৌভাগ্য সম্ভাবনায় তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ না চারি হাত এক হইতেছে, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই, কথায় বলে, "লাখ্ কথা না হ'লে কি বিয়ে হয়?" তিনি ভগ্নীপতিকে কহিলেন, "তোমার তাহ'লে মত আছে তো? না থাক্‌বেই বা কেন? তোমার অদৃষ্টে এমন জামাই আপনা হ'তে

জোটা পরম ভাগ্যি। ছেলে তো হীরের টুক্‌রা, কত লোক পরমা-সুন্দরী মেয়ে, নগদ পাঁচ-ছ হাজার টাকা নিয়ে সাধাসাধি ক'র্‌ছে।"

বিজয় কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া কহিলেন, "দেখ দিদি, ভাগ্যের জোর তোমার—আমার নয়, সে তবে মেয়েরই অদৃষ্টদেবতার লীলা খেলা। তিনি যদি ওর কপালে জমিদার বাড়ীর বউ হওয়া লিখে থাকেন, তাহ'লে তা হবেই। তবে আমাদের বাহ্যতঃ লোকতঃ অনেক কাজ ক'র্‌বার, অনেক কথা ভেবে দেখ্‌বার আছে। আমাদের মত গরীবের কি ওঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করাটা সাজ্‌বে? ঝোঁকের মাথায় এখন বিয়েটা দিয়ে ফেলে শেষে যদি বৌয়ের রূপ ও বৌয়ের বাপের টাকার তহবিলের দিকে নজর প'ড়ে নিতান্তই হতাশ হ'য়ে পড়েন, তখন সে'টার সব চাপ প'ড়বে গিয়ে বেচারী ঐ মেয়েটির ওপোরে। তার তখন লাঞ্ছনার সীমা থাক্‌বে না।"

সারদা চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার যে সবটাতেই বাড়াবাড়ি, নিজের যে এককড়ার সঙ্গতি নেই, মেয়ে ওদিকে ধাড়ি হ'য়ে উঠ্‌লো, লোকে ছি ছি ক'র্‌বে, তোমার সেদিকে দৃষ্টি নেই। হিন্দুধর্ম্ম মেনে চল্‌তে হোলে, বেহ্ম, খৃষ্টানদের মতন গা জোয়ারী কল্লে ত চল্‌বে না! মেয়ের বিয়ে সময়ে দিতেই হবে, ওরা যখন সেধে কথা ফেল্‌ছেন, তখন কি আর সাত-পাঁচ কথা কইতে হয়? তপিস্তের জোর থাকে তবে না অমন ঘর বর জোটে?"

বরদা কহিলেন, "তা বিজয় যা ভয় ক'র্‌ছে, তাও নিতান্ত ফেল্‌বার কথা নয়, অমন অনেক সময় হয় বৈকি। তবে আমাদের এ-ক্ষেত্রে যখন সৌদামিনী নিজের চোখে মেয়ে পছন্দ ক'রে নিচ্ছে, তোমাদের দেবার কিছু ক্ষমতা নেই, তাও জান্‌ছে—তখন আর

ভবিষ্যতে খোঁটা দেবার কি রইল? তা ছাড়া ওর পয়সার অভাব নেই, ওর মনও খুব উঁচু, নিজে একদিন গরীবের মেয়ে ছিল, কাজেই গরীবের ওপর বেশ দরদ আছে। আর শচী—আহা, ছেলে তো না; রত্ন। মাথার ওপর বাপ খুড়ো নেই, অতো টাকার মালিক, তা একটি পয়সা দরকার হ'লে মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেয়, মায়ের এত কথার বাধ্য যে দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়। উঁচু কথাটি কইতে জানেনা, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, শরীরে কি দয়া মায়া।"

শুনিতে শুনিতে সারদার মন ভরিয়া উঠিল।—আহা এমন জামাই তাহার অদৃষ্টে জুটিবে!

বিজয় কহিলেন, "তা হ'লে আর কি, আমার অমতের আর কিছু রইল না। কিন্তু বিয়ে ওঁরা কবে দিতে চান, আর কোথায় দেবেন!—আর শচী ডাগর ছেলে, আজকালকার লেখাপড়া জানা; একবার তাকে ও যেন জিজ্ঞেস ক'রে তার মতটা নেওয়া হয়, কি বলেন দিদি?"

বরদা কহিলেন, "সে আমি জিজ্ঞেস্ করব এখন। সে তো রাত-দিন এইখানেই আছে। আর বিয়ে—তা সৌদামিনীকে জিজ্ঞেস্ করি, কবে দিতে চায়। বোধ হয় বোশেখ মাসের এদিকে হবে না। আর বর, বিয়ে ক'রতে তোমার দেশেতেই যাবে। আমি বলি কি, তোমার পক্ষে সেটা ভালই হবে। সেখানে পাঁচ জন আত্ম-বন্ধু নিয়ে ঘর করছ, এতো বড় কাজটা তাদের নিয়েই করা ভাল। এখানে এসে বিয়ে দিলে, তোমাকেও একটু খেলো হতে হয়, তার দরকার কি?"

বিজয় মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কহিলেন, "তা হ'লে তো

দিদি ভিন্ন আর আমার গতি নেই, অথচ দিদি যে দাদাকে ছেড়ে—অন্ততঃ সশরীরে যদিও যান, সমনে যাবেন না, তা হ'লেই দু'দিন গিয়েই উড়ু উড়ু ক'রতে থাক্‌বেন, অথচ দাদা যে চাকরী থেকে ছুটি পাবেন, সে ভরসা নেই, ওঁদের অফিসে নাকি এক, স্ত্রীর শয্যাগত ব্যায়রাম ছাড়া অন্য সময়ে ছুটি পাওয়া যায় না, তা হ'লে আমার উপায় ?"

বরদা কহিলেন, "এতো বড় ভারী একটা বিষয় নিয়ে তোমায় দেখ্‌ছি বেজায় ফষ্টি-নষ্টি হচ্ছে। যাতে ভাল হয়, সব দিক্ বজায় থাকে, এমন কিছু একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি। তা ভগবান করুন, সেই শুভদিন আগে আসুক-ই। তোমার দিন দিন বয়েস বাড়ছে, তা একটু ভারিক্কে মেজাজ হতে শিখ্‌লে না!"

সারদা আর একটু উসকাইয়া দিল, "দিন দিন যতো বুড়ো হচ্ছেন, রস ততোই উথলে উঠ্‌ছে। সব কথা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসাই কি ভাল লাগে ?"

বিজয় গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা দিদি, আপনারা যে আমায় গালাগালি দিচ্ছেন, তা প্রমাণ করুন দেখি, যে আমি বুড়ো হয়েছি ? কি তার নজীর ?"

বরদা কহিলেন, "কেন ? মাথার চুল তো দেখ্‌ছি দু'চারটে সাদা হ'তে সুরু হয়েছে, তারপর, ছেলে মেয়ের বাপ হয়েছ, আজ বাদে কাল জামাই হবে—আর কি চাও ?"

বিজয় কহিলেন, "ওগুলো বাজে প্রমাণ। একটাও টিক্‌বে না। বুড়ো কাকে বলে ? যার দেহে ও মনে জরার আধিপত্য জন্মেছে, সেই বুড়ো। আমি নিজের মনের জরা প্রাপ্তির তো কোনো কিছু চিহ্ন দেখ্‌তে বা বুঝ্‌তে পারছি' না, অথচ তোমরা

মুখের জোরে আমায় বুড়োর দলে ফেল্‌তে চাও? সে হবে না দিদি! দশ বছর আগে আমি যেমন ছিলাম, আজও ঠিক্ তাই আছি। সংসার আমার চোখে তেমনি চির নূতন, চির রহস্য-পূর্ণ-ই আছে। প্রকৃতির শোভা তেমনি সরস, তেমনি সজীব মনে হয়—মানুষকে ঠিক্ তেমনি কোরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয়, বিশ্বাস ক'রতে সাধ যায়, আর মনে হয়—সেও বুঝি আমায় এমনি অকপটে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। তবে কেমন ক'রে বুঝ্‌বো যে আমার যৌবন, আমায় সকল রকমে রিক্ত ক'রে চোলে গেছে? না—দিদি, অতো বড় অভিশাপ দিয়ো না।"

বরদা হাসিয়া কহিলেন, "কথার ভঙ্গী দেখ। না ভাই তোমার বুড়ো হ'য়ে কায নেই; চিরযৌবন হয়ে থাক তুমি, তা'তে আমার কোনো দুঃখ, কোনো হিংসে নেই। তবে এই ভয়, পাছে আবার নতুন কোবে, কোনো নব-যৌবনার খোঁজে না লেগে পড়।"

সারদা রাগিয়া কহিলেন, "দিদির ও দেখ্‌ছি পাগ্‌লামী সুরু হ'লো। কাজের কথা ফেলে এই সব ছ্যাব্‌লামি!—পেটের ভাতের খোঁজ থাকে না, আর এই সব রঙ্গ ভঙ্গ ও ভাল লাগে—আচ্ছা বটে।" সারদা উঠিয়া অন্যত্র গেলেন, সতীশ এই সময় শচীন্দ্রের হাত ধরিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, বিজয়কে কহিল, "বাবা, তোমায় মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে ডাক্‌তে এসেছে।"

বিজয় উঠিয়া পড়িলেন, বরদা কহিলেন, "মুখুজ্যেদের আড্ডায় তুমি ব'সলেই তো রাত এগারটার আগে দেখা দেবে না, আজ একটু সকালে সকালে এসো ভাই, কাজের কথা আছে।" "জো-হুকুম" বলিয়া বিজয় প্রস্থান করিলেন। শচীন্দ্র বসিতে বসিতে জেঠাইমার ডিবা হইতে দু'খিলি পান লইয়া মুখে তুলিল, বরদা

কহিলেন, "ভ্যালা পান খেতে শিখ্‌লি বাছা আমার, তোর পান যোগান দায় হ'লো দেখ্‌ছি।"

শচীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "জ্যেঠাইমা, তাতেই তো ও জিনিষ খেতে চাইতুম না, তুমি জোর ক'রে শেখালে, তখুনি বলেছিলুম, বাড়ীতে পানের পাট নেই, মা ও সব খান্‌না। আপনি বল্লেন, আপনি পান জোগাবার ভার নেবেন, তবেই না পান খেতে শিখেছি!"

বরদা কহিলেন, "তা বটে। ডাগরটি হয়েছিস্‌, পান না খেতে শিখ্‌লে শ্বশুর বাড়ীতে সবাই ঠাট্টা করবে যে। তা ছাড়া, অমন টুক্‌টুকে মুখখানি, পান খেলে ঠোঁট দু'টি লাল টুক্‌টুক্‌ করে, দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। তা বাছা, আমি তো চিরদিনের জন্যে পান সাজবার ভার নিই নি, বলেছিলুম, যে পর্য্যন্ত না বউমা না ঘরে আন্‌তে পারি—তা এইবার আমি বউ এনে দিচ্ছি, তা হ'লেই আমার ছুটি; কি বল্‌ রে?" লজ্জিত হইয়া শচীন্দ্র মুখ ফিরাইল, সতীশ সোৎসাহে কহিল, "বাঃ, শচী-দার বিয়ে বুঝি? মাসী-মা, শচী-দা গরমের ছুটিতে আমাদের বাড়ী বেড়াতে যাবে বলেছে, সেখান থেকে এসে বিয়ে হবে, নইলে শচী-দা বিয়ে করতে গেলে, আর আমাদের বাড়ী যাবে না।" শচীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। বঙ্গ-যুবার পক্ষে শ্বশুর বাড়ী যে এমনই একটি লোভনীয় বস্তু, সতীশ তাহা এই বয়সেই জানিয়া ফেলিয়াছে। বরদা কহিলেন, "আর তোদের দেশেই যদি শচীর বিয়ে হয়?"

সতীশ খুসী হইয়া কহিল, "ভালই তো হয়।"

বরদা সতীশকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "শচীর সঙ্গে যে পুঁটির বিয়ে হবে।—কি বলিস্‌ তুই?"

সতীশ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তখনি মাসীমার কোল হইতে

তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, মুহূর্ত্তে শচীন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বেশ হবে শচী-দা। ভুতি-দিদির বর—বসন্তকে কেমন একটা ফুট্‌বল কিনে দিয়েছে, তুমিও আমায় কিনে দেবে কি? বসন্তর জামাইবাবু বসন্তকে সিগারেটের ছবি কত দিয়েছে, তুমিও আমায় দেবে?—আচ্ছা।"

বরদা কহিলেন, "ওতো সিগারেট খায় না, যে তোকে ছবি দেবে? তোর ভগ্নীপোত হওয়া মহা দায় তা হ'লে দেখ্‌ছি, জ্যালা ছেলে তুই!"

সতীশ পিছু না হটিয়া কহিল, "শচী-দা যে আমায় বলেছে, স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে জোগাড় ক'রে দেবে!"

শচীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল, বরদা ও হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তা হ'লে তো দেখ্‌ছি, ভগ্নীপোত না হ'য়েও তুই সে জিনিষের বায়না দিয়েছিস্। তোর তো সব দিকেই জিৎ। বাবা শচী, এখন একটা কথা বলি শোন্, এখন লজ্জা ক'রবার সময় নয়, পুঁটিকে তোর পছন্দ হবে তো? তোর মতন সে সুন্দর নয়, তোর গ্রামের ন'পেরও যুক্তি নয়, কিন্তু সে বউ নিয়ে তুই সুখী হ'তে পারবি বাবা, তা আমি বলে রাখ্‌ছি। তবে তোর যদি পছন্দ না হয়, তাও আমায় খুলে বল্; তোর জন্যে খুঁজে-পেতে ডানা-কাটা পরীর মতন মেয়ে আমরা আন্‌তে পারবই। মেয়ের তো দেশে অভাব নেই, তোর মতন সোণার চাঁদ ছেলে বরং সবার নেই।"

শচীন্দ্র উত্তর দিবার জন্য উস্-খুস্ করিতে লাগিল, কিন্তু সে একটু লাজুক, জ্যেঠাইমার সঙ্গে তাহার খুব বনি-বনাও থাকিলেও আজ প্রথম বিবাহের কথায় কথা কহিতে বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। জ্যেঠাইমা শচীন্দ্রকে বেশ চিনিতেন, এইবার কথার সুর বদ্‌লাইলেন, "তা

পছন্দ না হয়েছে, নেই হ'লো। মেয়ে মানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছে, তখন ওর বিয়ে হবেই। ওর বাপ তা হ'লে অন্যত্র দেখুক।"

শচীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "মেয়ে-মানুষ হ'লেই বিয়ে হতেই হবে তার মানে কি জ্যেঠাইমা? যেমন তেমন যে সে একটাকে ধরে মেয়ে দিতেই হবে, এমন কেন?" জ্যেঠাইমা কহিলেন, "লেখা পড়া শিখছিস্, এ সব এখনও জানিস্ না? মেয়ে বড় হ'য়ে প'ড়লে, অগত্যা যার তার হাতে দিতে হয় বৈ কি, কিন্তু বাপ-মার কি সাধ যে ভাল ঘর বর না দেখে মেয়ের বিয়ে দ্যায়? পয়সার জোর থাক্‌লে সে রকম সাধ সাজে, যারা গরীব তাদের ভাল মন্দর বিচার কি?"

শচীন্দ্র কহিল, "আমি কিন্তু গরীবের মেয়েই বিয়ে ক'র্‌বো।"

জ্যেঠাইমা কহিলেন, "তবে বল্ না বাছা, পুঁটিকেই বিয়ে কর্‌বি? বলতে লজ্জা হচ্চে, না?"

শচীন্দ্র হাসিয়া উঠিল, জ্যেঠাইমা ও হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বেঁচে থাক্ বাপ, মায়ের শিবরাত্তির—মায়ের কোল জোড়া ক'রে, বেঁচে থাক্। আমাদের দেখে চোখ জুড়ুক। আমার চুলের মতন তোর পরমায়ু হোক্, দশজনাকে প্রতিপালন কর্, এই আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।" শচীন্দ্র জ্যেঠাইমার পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "জ্যেঠাইমার তো আশীর্ব্বাদ শুনতে শুনতে কাণ আমার ক্ষ'য়ে গেল, আমি সবগুলোই নোট করে রাখ্‌ছি—দেখ্‌ব, ক'টা ফলে! তুমি তো আমায় রোজই এই সব ব'লে আশীর্ব্বাদ কর জ্যেঠাইমা, তোমার বুঝি এইগুলোই আশীর্ব্বাদের ঝুলির পুঁজি?"

জ্যেঠাইমা কহিলেন, "গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ফলে বৈকি বাপ্? তবে এখন কলিকাল, সকল সময় ফলেও না।"

শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবু একদিকে রক্ষে, নইলে আমাদের শ্যামা-ঝি, আর তোমার বাড়ীর বামুন-পিসি, দিন-রাত্তির লোকের উদ্দেশে যে শাপ-শাপান্ত করে, সেগুলো সত্যি সত্যি ফল্‌লে দেশে মহামারী লেগে থাকতো।"

জ্যেঠাইমা হাসিতে লাগিলেন, সতীশ ধৈর্য্য ধরিয়া সব কথা গুলা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল, এইবার কহিল, "তবে শচী-দা, পুঁটি-দি'র যদি তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়, তা হ'লে তোমাতে আমাতে যখন মাছ ধরতে যাব, ও তো আর চার-টার গুলো সঙ্গে নিয়ে যাবে না? আমি ছিপ্ নোব, না ঐ সব ব'য়ে বেড়াব?" বরের সহিত লজ্জার গুরুতর নিকট সম্পর্ক আছে, সতীশ বেচারী তাহা অনবগত ছিল না, সুতরাং এ দুশ্চিন্তা তাহার কাছে সমস্যার মত মনে হইতে লাগিল, জ্যেঠাইমা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "আমাদের রাখাল ছোঁড়াকে সঙ্গে নিবি।" এইবার সতীশ খুব খুসী হইয়া হাততালি দিয়া কহিল, "বিয়েতে খুব সন্দেশ খাব, কেমন বাজনা হবে, আলো হবে, সতীশ-দা আমায় তুমি নিৎ বর সাজিয়ো, আমি জরীর পোষাক প'রবো। তোমার তো ছোট ভাই-টাই নেই, কি বল মাসীমা?" শচীন্দ্র হাসিয়া উঠিল, মাসীমা কহিলেন, "তুই যে ক'নের ভাই রে, নিৎ-বর সাজ্‌বি কি কোরে? বরং নিৎ-ক'নে সাজিস্।" নিজের পৌরুষত্বে আঘাত পাইয়া সগর্ব্বে সতীশ কহিল, "মাসীমা, তুমি কি বোকা! আমি যে ব্যাটা ছেলে, আমি কি ক'রে নিৎ-ক'নে সাজ্‌বে?—ছি!"

(ইতি প্রথম খণ্ড)

১৩ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩

সন্ধ্যার আঁধার-ছায়া দিগন্ত ঘনাইয়া একখানি কাল-যবনিকার মত ধরা বক্ষে নামিয়া আসিতেছিল, গৃহে গৃহে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, পুরাঙ্গনারা দীপ জ্বালিয়া তুলসীমূলে প্রণাম করিতেছেন, হরি সভায় ঠাকুরের আরতির কাঁসী ও ঘণ্টা ঘন ঘন বাজিতেছে, বাতাসা-লোলুপ ছেলে-মেয়ের দল মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া, উচ্চকণ্ঠে হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে চারিদিক মুখর করিয়া তুলিয়াছে; এই সময়ে রজনীর সান্ধ্য-সভায় বন্ধুগণ অনেকেই সমবেত হইয়াছিলেন। রজনী সেতার বাজাইতেছিলেন, বিজয় হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া হৃদয়ের সহিত গাহিতেছেন,—

"হেথা যে গান গাইতে আসা, আজও হয়নি সে গান গাওয়া,
আজো কেবলি সে সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে যাওয়া।
আমার লাগে নাই সে সুর,
আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে,
গানেরই ব্যাকুলতা!"

সকলেই স্তব্ধভাবে বসিয়া স্বীয় হৃদয়ে গভীর সত্যরূপে অনুভব করিতেছিলেন,—"শুধু প্রাণের-ই মাঝখানে আছে, গভীর ব্যাকুলতা।" বিজয়ের স্বর ক্রমেই যেন আর্দ্র হইতে আর্দ্রতর হইয়া আসিল, স্নিগ্ধ-করুণ-কণ্ঠে তিনি গাহিতেছেন,—

"শুধু আসন পাতা হ'ল আমার, সারাটি দিন ধরে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাক্‌বো কেমন ক'রে।
আছি, পাবার আশা নিয়ে, তারে হয়নি আমার পাওয়া।"

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া গানটি গাহিবার পর, বিজয় নীরব হইলেন। পথের ধারে অনেকেই পথ চলিতে চলিতে, গান শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছা করিতেছিলেন, আরও দু'একটা গান হয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কেহ বলিতে পারিলেন না, যেহেতু গায়ক ও সেতার-বাদক উভয়েই যেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া ছিলেন। গানের প্রত্যেকটি অক্ষর বিজয়ের মনে এমন একটি আকুলতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল; যাহাতে নিজেই তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন, যাঁহার বিষয়ে তিনি বেশ এক রকম নিশ্চিন্তই হইয়া আছেন, যাঁহাকে চিন্তাতীত, ধ্যানাতীত আখ্যা দিয়া, এবং যাঁহাকে নিজের কর্ম্ম-বন্ধনে নিগূঢ় নিবদ্ধ জানিয়া, তিনি মনের সঙ্গে পর্য্যন্ত শোধ-বোধ করিয়া রাখিয়াছেন, আজ আবার তাঁহারই জন্য মন-প্রাণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতে চায় কেন? যেন জন্ম-জন্মান্তর হইতে, চির-বিরহিনী হিয়া, চির-তৃষাতুর, পিপাসিতা হইয়া তাঁহারই প্রেমামৃত পানের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে, উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। একি রহস্য! এ কি জটিল সমস্যা! বিজয় মনে মনে ডাকিলেন "ওগো রহস্যেরও অতীত, ওগো চির-দুর্জ্জেয়, কোথা হোতে এমন

কোরে দোলা দিচ্ছ, ওগো প্রেমের ঠাকুর, ওগো করুণাময়, ওগো চির-নিষ্ঠুর, দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এ জীবনটাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ, কিছুই বুঝতে পারি না! কত অভিযোগ মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উদ্যত হোয়ে উঠ্‌তে চায়, কিন্তু সে সব তোমার কাছে পেশ করবার পর্য্যন্ত অধিকার রাখনি—তাতেই যে সন্দেহ হয় প্রভু, বুঝি সে অভিযোগ শোন্‌বারও অধিকার তোমার নেই।"

রজনী মাথা নত করিয়া, যুক্ত করে দেবোদ্দেশে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিজয়ও উঠিয়া পড়িলেন। রজনী কহিলেন, "বিজয়, আজ গুরুদেব চিঠি লিখেছেন, তিনি হরিদ্বারেই এখন ক'মাস থাক্‌বেন, তোমার মেয়ের বিয়ে তো এক মাস হচ্ছে না, অগ্রাণ মাসের আগেই গুরুদেব ফির্‌বেন সুতরাং অগ্রাণ মাসে হোলে তিনি উপস্থিত থাক্‌তে পারবেন।"

বিজয় কহিলেন, "তিনি কিন্তু যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখাও কর্‌লেন না, আমার কিছু বল্‌বার ছিল।"

পরেশ কহিলেন, "আর আমাদেরই কি জানিয়েছিলেন? কাউকেই বলা কওয়া নেই, হঠাৎ রাত্রের ট্রেণে চলে গেছেন, সকালে রজনীর কাছে এসে শুনলুম!"

যামিনী কহিলেন, "বিয়ে কি এ মাসে হবে না বিজয়? 'শুভস্য শীঘ্রং' শুভ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়, বিশেষ কপাল-জোরে যখন অমন সুপাত্র পেয়েছ।"

বিজয় কহিলেন, "আমার তো দেবার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু ছেলের জোড়া-বছর বোলে হবে না, অগ্রাণ মাসেই বোধ হয় হবে!"

যামিনী কহিলেন, "কিন্তু বড় লোকের খামখেয়ালী মেজাজকে বিশ্বাস নেই, যদি আবার ঝোঁকের মত বদ্‌লে যায়!"

বিজয় কহিলেন, "বিশ্বাস তো হয় না, অন্ততঃ মানুষকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহ'লে বরের যিনি মা, তাঁর চরিত্র এমনিই খাঁটি,- কপটতা তার মধ্যে নেই।"

পরেশ কহিলেন, "ভালই তা হোলে, আজ কালকার বাজারে একটি পয়সা ও না দিয়ে যে অমন সুপাত্র জোগাড় করেছ, সে'টা খুবই সৌভাগ্যের কথা।"

বিজয় কহিলেন, "সে তো বটেই—অন্ততঃ তোমরা তা না মান্‌লেও আমার মতন অদৃষ্টবাদী তা তো মান্‌বেই। আমি তো ভেবেছিলুম যামিনী, তোমারই কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়বো, যদিই দয়া কোরে প্রফুল্লর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিতে রাজী হও, নিঃসম্বল হোয়ে বরের বাজারে বেরুলে, বরকর্ত্তারা যে কাণ মলে ঘাড় ধোরে বাজার থেকে বের কোরে দিতেন ; তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার কাছে সে অপমানের আর ভয় ছিল না, তবে অন্তরাল থেকে গিন্নি' যদি দু'চারটা শাপ-মন্নি দিতেন, এই পর্য্যন্ত!"

সনৎ কহিলেন, "যামিনী, খুব বেঁচে গেছ ভাই, ও ছিনে-জোঁকের পাল্লায় প'ড়লে তোমার আর নিস্তার ছিল না, এই গেল বারে তুমি দু'হাজার টাকা খরচ কোরে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছ, ছেলের বিয়েতে সেটা তো অন্ততঃ আদায় হওয়া চাই!"

আরও দু'চার বছর পূর্ব্বে হইলে যামিনী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিত, কিন্তু এখন তাহার অবস্থার সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ছেলেটী এ বৎসর ম্যাট্রিক পাস দিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে

গিয়াছে। গৃহিণী এখন হইতেই ছেলের বিবাহের তাগাদা লাগাইয়াছেন, তাঁহার ফর্দ্দটিও বড় মন্দ নয়। যামিনী পূর্ব্বে অর্থাৎ কন্যার বিবাহের সময় পর্য্যন্ত পণ-প্রথার বিষম বিরোধী ছিলেন, সুতরাং গৃহিণীর ফর্দ্দ শুনিয়া আপত্তি করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু সে আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকালে টিকিবার মত নয়, যে হেতু—সত্যই তো, ছেলে কিছু তাঁহার একলার নহে, তার উপর যে গৃহিণীর অঞ্চলাশ্রয়ে বাস করিয়া মনুষ্য জন্ম কাটাইতে হইবে; কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সেই গৃহিণীর সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা বাধাইয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতে সাহস করে? যামিনী কোনো কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রজনী কহিলেন, "এখন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যেমন সু-পাত্রটি পেয়েছ, ভালয় ভালয় শুভ বিবাহটি সম্পন্ন হয়ে গেলেই মঙ্গল। তোমার একটিমাত্র মেয়ে, সুপাত্রে ন্যস্ত হোয়ে সুখে থাক্, এই আমাদের কামনা।" বিজয় অন্তরের সহিত বন্ধুর এ আন্তরিক মঙ্গল কামনাকে অভিনন্দন করিল, কিন্তু কে বলিতে পারে, এ জগতে প্রাণপূর্ণ আশীর্ব্বাদ, বা জ্বালাময় অভিসম্পাতের কোনো মূল্য আছে কি না!

বন্ধু যখন পবিত্র চিত্তে, সরল প্রাণে বন্ধুর শুভ কামনা প্রার্থনা করিতেছিলেন; বন্ধু যখন বন্ধুর সেই প্রাণভরা কামনা, প্রার্থনাকে সসম্ভ্রমে মণে প্রাণে বরণ করিয়া লইতেছিলেন; অলক্ষ্যে তখন ভাগ্যদেবতার ক্রূর, নিষ্ঠুর হাসির ছায়ায়—ভবিষ্যতাকাশ বুঝি ম্লান হইয়া উঠিতেছিল।

১৪

শ্রাবণের অজস্র ধারা বর্ষণে চারিদিক প্লাবিত হইতেছে, কর্ম্মহীন রবিবারের দ্বি-প্রহরে, নিজ নিজ গৃহে একা যাপন করা নিতান্তই কষ্টকর দেখিয়া—বন্ধুগণ ছাতা মাথায় এক একটী করিয়া রজনীর বৈঠকে সমাগত হইতেছেন, তাস খেলিবার আয়োজন চলিতেছে, এই সময়ে ভিজিতে ভিজিতে বিজয়কে আসিতে দেখিয়া সকলেই কি একটা বিশেষ প্রয়োজন কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। রজনী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ব্যাপার কি বিজয়! এই দুর্য্যোগে মাথায় ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছ ; জলে ভিজে অসুখ করবে যে।"

বিজয় কহিলেন, "আর দাদা, তখন আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে দেখে ছাতা না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলুম, তার পর রাস্তায় আকাশ যেন মাথায় ভেঙে প'ড়লো। ধানক্ষেতে আলের মুখ কেটে আড়া পেতেছিলুম, পাঁচ-ছ'সের চিঙড়ী, পুঁটী আর বেশ বড় বড় মৌরলা মাছ পড়েছে,নিতাইকে দিয়ে ঘরে কিছু পাঠিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্যেও কিছু নিয়ে এলুম, সবাই তো এখানে উপস্থিত দেখ্‌ছি, তুমি তা হোলে এ গুলো ভাগ কোরে সবাইকে দিয়ে দাও।" বিজয় মাছের পুটলী নামাইয়া রাখিলেন, রজনী কহিলেন, "এখন ভিজে কাপড় ছোড়, গা মাথা মুছে একখানা শুক্‌নো কাপড় প'রে ফেলো, এক পেয়ালা গরম চা বরং আনিয়ে দিই, খেয়ে নাও। সামান্য মাছের জন্যে এই ভেজা—কি মানুষ, তুমি বিজয়!"

বিজয় কহিলেন, "আর ভাই চাষা মানুষের ধাতে রোদ-বৃষ্টি দুই-ই খুব সয়, নইলে ক্ষেতে আর ফসল জন্মাতো না।"

তার পর গা মাথা মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া বিজয় স্থির হইয়া বসিলেন, রজনীর অনুরোধে চা পান করিয়া ভীমকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিলেন। রজনী নিজে তামাক না খাইলেও বন্ধুদের জন্য সমস্তই যোগাড় রাখিতেন।

বিজয় ভীমের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দু' এক টান দিয়াই কহিলেন, "ভগবান কি জিনিষই এই অধম বাঙ্গালীর জন্যে সৃষ্টি করেছেন! সাহেবের কাণমলা, পরিবারের মুখনাড়া ইত্যাদি মানসিক ক্লান্তি থেকে দৈহিক ক্লান্তি সবই এর প্রসাদে নিমেষে দূর হ'য়ে যায়।"

সনৎ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বিজয়, খুব তো হৃষ্টচিত্তে তামাকের বন্দনা গাইতে সুরু ক'রেছ। কিন্তু এদিকে এ কি প্রমাদ ঘটিয়ে বসেছ? এ যে সাধ ক'রে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা।"

বিজয় সবিস্ময়ে কহিলেন, "কি রকম? আমার নিজের বিপদ-অথচ আমি নিজেই কিছুই জানিনা? টিকের আগুনে কোঁচার খুঁট ধরিয়ে বসিনি তো? না, তাও তো নয়!"

সনৎ কহিলেন, "সব কথাতেই তোমার ছ্যাবলামি। বলি, সামনে তোমার মেয়ের বিয়ে, আর তুমি কিনা এক নষ্ট-দুষ্ট সদ্‌গোপের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে ব'স্‌লে! তোমার কিছু কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? দশমাস তার গর্ভ শুনছি, কোনদিন প্রসব হ'য়ে ব'সবে, গেরস্থর পবিত্র ঘরবাড়ীতে পরের কলঙ্কের বোঝা টেনে এনে—একি তোমার গেরো? তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি, পাড়ায় এ নিয়ে খুব গোলমাল বেধে গেছে।"

বিজয় হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "যা করেছি, তার

আগু পাছু সবটা ভেবে নেবার তখন মোটেই অবসর ছিল না। সন্ধ্যার সময় যখন মাঠ থেকে ফিরছি, তখন দেখি গাছের তলায় একটা স্ত্রীলোক পথশ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে নির্জ্জীবের মতন পড়ে আছে, রাজ্যের মেয়ে পুরুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। মেয়েটির বয়স অল্প, দেখেই বুঝতে পারা যায়—পথে ঘাটে বেরুতে সে অভ্যস্ত নয়, একখানা ছেঁড়া কাপড়ে—দেহের লজ্জা যেন ঢাক্‌তে না পেরে বিব্রত হ'য়ে পড়েছে, পুরুষগুলোর নির্লজ্জ দৃষ্টির সাম্‌নে বেচারা মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইছে—এমনি ভাব।

পরেশ কহিলেন, "লজ্জাবতী লতা আর কি, কুলে কালী দেবার সময় লজ্জা হয়নি!"

বিজয় সে কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন, "ভিড় ঠেলে যখন মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রলুম, "কোথায় যাবে মা তুমি?" মেয়েটি এমন আকুলভাবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল' যা'তে বুঝ্‌তে পারলুম, তার যাবার মতন কোন জায়গা নেই—"

বাধা দিয়া সনৎ কহিলেন, "তাতেই মাথায় ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে গেলে, আচ্ছা দয়ার শরীর বটে।"

পরেশ কহিলেন, "আর মাতৃনামের অবমাননাটাও করেছ ভাল, 'মা' ব'ল্‌তে আর কাউকে পেলে না, একটা কুল-ভ্রষ্টা নারীকে মাতৃসম্বোধন; ছি—ছি!"

বিজয়ের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কহিলেন, "নিতান্ত হৃদয়হীন নির্ব্বোধের মতন, অজ্ঞভাবে বিচার ক'রো না। যে অন্যায় করেছে, তার নাম শোন্‌বামাত্র বিমুখ হ'য়ে ওঠা আমাদের প্রকৃতিগত, মজ্জাগত অভ্যাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ একটু তলিয়ে ভেবে

দেখি না যে, পাপকে পাপ ব'লে যথেষ্ট ঘৃণা ক'রলেও অনেকস্থলে পরোক্ষে সেই পাপকেই আমরা প্রশ্রয় দিয়ে থাকি।"

সনৎ বন্ধুদিগের প্রতি চোখ টিপিয়া ঠোঁটের কোণে মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন, "যেমন এই তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ।"

বিজয় উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। সে নীরবতা কিন্তু পরেশ ও সনতের গায়ে সূচীর মতন বিঁধিতে লাগিল, যেহেতু বিজয়ের স্বভাব তাঁহারা ভালরূপই জানিতেন, তর্কে হারিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রই তিনি নহেন, তবে যে কথাগুলা, তাঁহার গ্রাহ্যের মধ্যে বলিয়া মনে করেন না, সে গুলার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করিয়া চুপ করিয়া থাকাই তিনি শ্রেয় বিবেচনা করেন। যামিনী ও বন্ধুর এ অন্যায় কাজ মোটেই পছন্দ করেন নাই, গত রাত্রে বিজয়ের অনুপস্থিতিতে এ প্রসঙ্গ লইয়া তীব্র আলোচনা চলিয়াছিল; তবে রজনী, বন্ধুর এ কাজটাকে বড় লঘু চক্ষে দেখেন নাই, বরং বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া, বন্ধুমহলে যথেষ্ট তিরস্কার ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

অসহ্য নীরবতার বক্ষ ভেদ করিয়া সহসা বিজয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "রজনী, সত্য কথা বলো, আমরা সকলেই আশৈশব এক সঙ্গেই বর্দ্ধিত হয়েছি, এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ কোরে, সংসার-জীবনে প্রবেশ করিছি, সংসারের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতাও পেয়েছি! বন্ধুর নিকটে বন্ধুর হৃদয় ভাব গোপন কর্‌বার কিছু আবশ্যক নেই। তুমি যদি ঐ নিরাশ্রয়া হতভাগিনীকে অসহায় ভাবে পথের মধ্যে প'ড়ে থাক্‌তে দেখ্‌তে, তাহোলে কি ক'রতে?"

রজনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হঠাৎ এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না, সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রজনীর মুখের প্রতি

চাহিয়া রহিলেন, বিজয় আবার কহিলেন, "অভাগিনীকে ঐ অবস্থায় দেখে মুখ ফিরিয়ে যে তুমি চোলে যেতে পার্‌তে; তাও আমার বিশ্বাস হয় না, অন্ততঃ তুমি—তবু সত্য কথাই বল, যে তুমি তখন কি করতে। তোমার বিবেক কি তোমায় তার জন্যে একটুও সাহায্য ক'র্‌তে বল্‌ত না?" রজনী কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া, বিজয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ধীরভাবে কহিলেন, "আমি হ'লে কখনই এ পতিতা নারীকে এ অবস্থায় ঘরে ঠাঁই দিতে পার্‌তুম না, সোজা হাসপাতালের বন্দোবস্ত করে দিতুম।"

বিজয়-গর্ব্বে বন্ধুগণ করতাল দিয়া উঠিলেন, পরেশ সজোরে টেবিলে হাত চাপড়াইয়া কহিলেন, "Bravo"! সকলের আনন্দ-ধ্বনিকে মুহূর্ত্তে ডুবাইয়া দিয়া রজনী শান্তকণ্ঠে আবার কহিলেন, "কিন্তু কেন আমার ঘরে ঠাঁই দিতে পার্‌তুম না, তা জান? তোমার মতন সাহস বা তেজ আমার নেই, সেই জন্যেই এ দুঃসাহসিক কায আমি ক'র্‌তে পারতুম না। সমাজে বাস ক'রে সকলের লাঞ্ছনা, টিট্‌কিরী, উপহাসকে ভ্রুকুটি কোরে অগ্রাহ্য কর্‌বার শক্তির প্রাচুর্য্য আমার প্রাণে নেই—একথা স্বীকার ক'র্‌তে আমি লজ্জিত হচ্ছি না। লোক নিন্দার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করা বড় কঠিন কথা বিজয়! সংসারে—যারা যে কাজটা ভাল বোঝে, অথচ লোক নিন্দার ভয়ে সে'টা করতে সাহসে কুলোয় না, কিন্তু নিজের সে দুর্ব্বলতাটুকু, নানা কূট যুক্তির প্রশ্রয়ে ঢাকতে চায়—তাহাদেরই আমি যথার্থ কাপুরুষ মনে করি।"

বিজয় বন্ধুর নিকট এই ধরণেরই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে স্বচ্ছন্দতার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "রজনী, আমার স্ত্রীও প্রথমটা খুব চ'টে উঠেছিলেন, কিন্তু মেয়েটির সমস্ত কথা শুনে তিনি না

কেঁদে থাক্‌তে পারেন নি। মেয়েটির নাম সরলা, আমার স্ত্রীর কাছে, সে অকপটে নিজের পাপ, দোষ সবই স্বীকার করেছে। বাল-বিধবা সে, তার গর্ভ হয়েছে জান্‌তে পেরে, সকলে তা'কে ওষুধ খাইয়ে, সমাজের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে মুক্তি পাবার যুক্তি এঁটেছিল, সরলা তাতে রাজী হয়নি, ব'লেছিল, একট.. পাপ করেছি, কিন্তু সে পাপের বোঝা আর বাড়াতে পার্‌বো না।" সরলা শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল, তার এক দেওর তার সর্ব্বনাশ ক'রেছিল, সে বড় মানুষের মেয়ে, বাপের আর ছেলে মেয়ে না থাকায় সেই বিষয় সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ্‌, সুতরাং তা'কে বিদায় কোর্‌তেও শ্বশুর বাড়ীর লোকের ইচ্ছে নেই, অগত্যা তারা পরামর্শ ক'র্‌লে যে, যথা সময়ে তীর্থ যাত্রার নাম ক'রে কাশী কি বৃন্দাবনে সরলাকে নিয়ে গিয়ে, ছেলে হবা মাত্র সে'টাকে নষ্ট ক'রে, কি কাউকে বিলিয়ে দিয়ে চোলে আস্‌বে। সরলা কিন্তু সব বুঝ্‌তে পেরে খুব সতর্ক হয়েছিল, ওরা গ্রাম থেকে গরুর গাড়ী ক'রে রওনা হয়েছিল; কাশী যাবার উদ্দেশে ষ্টেশনে আস্‌ছিল, সরলা কোন ফাঁকে গরুর গাড়ী থেকে নেমে পালিয়ে এসেছে, তারপর পথে এই ব্যাপার। তার যে কান্না! ব'ল্‌ছে,—ছেলেটা যদি পেটে না জন্মাতো, স্বচ্ছন্দে আমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পার্‌তুম, কিন্তু যখন পেটে ধরেছি, তখন যত পাপই করি না কেন, তাকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌ব না। রজনী, আমাদের সংসারে এমন ব্যাপার কত ঘট্‌ছে, ছোট লোক বোলে যাদের তুচ্ছ জ্ঞান করি, সেই গয়লা, চাষা-কৈবর্ত্তদের ঘরে শুধু নয়, শুনে শিউরে উঠো না—ভদ্র কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক বনেদী ঘরেও এ ব্যাপার অনেক ঘট্‌ছে, কিন্তু পরিণাম, সেই সব জায়গাতেই একই, অর্থাৎ

অসঙ্কোচে প্রাণ হত্যা, শিশুহত্যা। ডাক্তার, কবিরাজ অর্থলোভে সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য ক'র্‌ছেন, কিন্তু আজ এই অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ের মনের যে তেজ যে শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, এমনটি বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

কেহ কোনো উত্তর দিলেন না, তখন সনৎ কহিলেন, "কেমন কোরেই বা পাওয়া যাবে বল? ভদ্র ঘরে যদি বা এরকম কেলেঙ্কারী ঘটে, তখন পথে ঘাটে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, ঘর-গুষ্টির মুখ হাসাবার শক্তি তো ভদ্র ঘরের মেয়ের থাকে না; পাপ যখন ক'রেই বসে, তখন পাপ দিয়েই তার সে পাপ ঢাকা ভিন্ন আর উপায় কি থাকে?"

"কাজেই"—বজ্রকণ্ঠে বিজয় বলিয়া উঠিলেন, "কাজেই প্রাণ-হত্যা বা শিশুহত্যা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই—এই তো ব'ল্‌তে চাও তুমি? ধিক্ সমাজের শাসনকে, ধিক্ তার বিচার বুদ্ধিকে, পুরুষকে শাসন করবার, সংযত করবার কোনো উপায় না স্থির কোরে, নারীর উপরে আর নিতান্ত অসহায় প্রাণের উপরে যত কিছু শোধ নেবার চেষ্টা। আমরা মানুষ, না রাক্ষস! আমরাই আবার ধর্ম্মের বড়াই মনুষ্যত্বের বড়াই কোরে বেড়াই, ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে, ধিক্ আমাদের পৌরুষত্বে।"

সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বিজয় এমন দৃঢ়তার সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, যাহার প্রতিবাদ করিবার মতন কথা তখন আর কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না। দম্‌কা বাতাস—ঝড়ের বেগে বহিয়া, সে কথার উত্তরে হা হা করিয়া সাড়া দিল মাত্র।

১৫

সন্ধ্যার পর সারদা ভাতের ফেন গালিয়া, উনানে কড়া

চাপাইয়া তরকারী ধুইয়া লইতেছেন, সরলা সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া ঘরে ধুনা দেওয়া সারিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "শিলের বাট্‌না যে প'ড়ে রয়েছে মা, বেটে তুলে দিই ?" সারদা কহিলেন, "তরকারী চাপিয়ে আমিই বেটে নিচ্ছি, তুমি ব'স।" সরলা বড় লজ্জিত হইল, যেহেতু সে বুঝিতে পারিল,—সারদা তাহার বাটা লইবেন না, তার বলিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা হইয়াছে। সত্যই তো, সে অভাগিনী যে ইঁহাদের পবিত্র আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে এই ঢের, এর বেশী সে চায় কি বলিয়া! সরলার দুই চোখ বহিয়া অশ্রুধারা নামিল, সারদা টের পাইয়া কহিলেন, "ছিঃ বাছা, কাঁদ্‌ছ কেন? এতে আর কান্নার কি আছে, আমি আর কি ক'রব বল, পাঁচজনকে নিয়ে তো আমাদের ঘর ক'রতে হয়; কাল তুমি বাট্‌না বাট্‌ছিলে, ও পাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েরা সব বেড়াতে এসে কত কথা ব'লে গেল, নইলে আমি তো কিছু দোষ ধরিনি, আর উনি তো সদাশিব মানুষ, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তবে কি না সমাজে বাস ক'রতে হ'লে সর্ব্বদিক বজায় রেখে চ'লতে হবে তো, নইলে—"

"নইলে সমাজ তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ ক'রবে, আর বন্ধ ক'রবে তোমার এবাড়ী-ওবাড়ী নেমন্তন্ন যাওয়া। মধ্যে-মাঝে ফাঁক্‌তালে লুচিটা সন্দেশটা, মাছের মুড়োটা, যা পাওয়া যেতো— সে'টার লোক্‌সান যে বড় ভয়ানক!"

বিজয় বাড়ী ছিলেন না, আসিয়া পড়িলেন মাত্র। সরলা বিজয়কে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া একটু জড়সড় হইয়া বসিল; সারদাও হাত ধুইয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া, উঁচু গলায় কহি-লেন, "সব তাতেই জেদ কোরো না, সামনে মেয়ের বিয়ে আস্‌ছে,

সুভালাভালিতে চার হাত মিলিয়ে দিতে পার্‌লে বাঁচি, তুমি তো গায়ে কিছু মাখ না, কিন্তু আমায় যে পাঁচমুখে পাঁচকথা শুন্‌তে হয়।"

বিজয় কহিলেন, "তোমার গায়েও যে বেশী কিছু লেগে আছে, তা'তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। লোকের পাঁচ কথায় এতো কাণই দেবার বা দরকার কি? যাঁরা পাঁচ কথা ব'ল্‌তে আসেন, তাঁদের জিজ্ঞেস ক'রো, তাঁদের বাড়ী যারা দাসী, তারা কিছু আর সতী-সাবিত্রী নন্‌, তবে তাদের হাতের জল, বাটনা তাঁরা খান কি ক'রে? আর রান্নাঘরে যে পাচকা ঠাক্‌রুণকে অন্নপূর্ণার ঠাঁই বাহাল ক'রে দিয়েছেন, তাঁর ঠিকুজি কুলজী কি খুব বেশী জানা? লোকের চোখ রাঙানীতে অতো ভয় না পেয়ে, যা ভাল বুঝ্‌বে ক'রে যাবে। তাতে ভয় পাও কেন?"

সারদা কহিলেন, "লোকের কথায় কাণ না দিতে চাও তো ব'নে গিয়ে বাস করগে, সংসারী হ'য়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে তাহ'লে ঘর করা চলে না, সমাজের শাসন মান্‌বে না, লোক নিন্দাকে ভয় ক'রবে না, এইবা তোমার কোন্‌ ধর্ম্ম!"

বিজয় হাসিয়া কহিলেন, "সমাজের চাইতে আমার বড় ধর্ম্ম আমার বিবেক। সমাজের লোকের যেমন ভাল মন্দ বিচার ক'রবার শক্তি আছে, আমার বিবেকেরও যে তার চাইতে কিছু কম বিচার-বুদ্ধি আছে, তা আমি স্বীকার করি না, সেইজন্যেই সব সময়ে সমাজের চোখ রাঙানীতে আমি ভয় পাই না। এখন যাক্‌ সে কথা; ক্ষিদেতে আমার পেট জ্বালা ক'রছে, দু'টি ভাত বেড়ে ফ্যালো। সরলা তুমি এক গ্লাস জল এনে দাও মা, তেষ্টাটাও বড় কম পায়নি, পুঁটি, সতীশ এরাই বা গেল কোথা?"

বলিতে বলিতে পুঁটি, সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশ

কহিল, "বাবা, আজ শোভা-দিদিদের বাড়ীতে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম।" বিজয় কহিলেন, "বটে? কার বিয়ে হ'লো, আমি তো কিছুই জান্‌তে পারিনি!" পুঁটি কহিল, "তোমার যে কিছুই মনে থাকে না বাবা, পরশুদিন তোমায় বল্‌লুম না যে আমার মেয়ের সঙ্গে, কলের ছেলের বিয়ে!"

বিজয় কহিলেন, "ও রকম শুধু শুধু ব'ল্‌লে কি মনে থাকে রে? নেমন্তন্নর লুচি-সন্দেশ সাম্‌নে এনে ধর্‌বি, তবে তো পাকা হোয়ে মনে থাক্‌বে।"

সারদা কহিলেন, "তোরা তো খেয়ে এসেছিস্, আর তো খাবি না, তুমি তবে একলাই খেতে বোসো গো।"

সতীশ কহিল, "বা—রে, এতটুকু কোরে দু'খানা লুচি, আর ছোট্ট একটি সন্দেশ, তাই খেয়ে বুঝি পেট ভরে?"

পুঁটি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "বেশ তো ছেলে তুই! কুটুম বাড়ী খেয়ে এসে নিন্দে ক'র্‌ছিস্? পুতুলের বিয়েতে কি পেট ভোরে খাওয়ায়?—কি বল বাবা!"

১৬

সেই দিন রাত্রি দশটার পর, সকলে যখন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, সারদা গৃহ কর্ম্ম সারিয়া শুইতে যাইবার সময় পাশের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলেন, স্তিমিত প্রদীপের আলোকে, সরলা এখনও বসিয়া আছে, শয়ন করে নাই। সারদা কহিলেন, "এখনও বোসে আছ কেন মা, অনেক রাত্রি হোলো, শুয়ে ঘুমোও। সারদার মনে হইল, সন্ধ্যার সময় সেই ছোঁয়া-খাওয়ার কথায় বুঝি সরলার মনে বড় বেশী আঘাত লাগিয়াছে। আহা, এখানে তার আপনার কেহ নাই, সে যখন সারদার আশ্রয়ে আসিয়া

পড়িয়াছে, তখন অন্যে তাহাকে ঘৃণা করিলেও তার কি তা করা উচিৎ? সারদার মন স্নেহ-রসে ভরিয়া উঠিল; সরলার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, “ঘুমোও মা, সন্ধ্যের সময়ের সে সব কথার কিছু মনে কোরো না।”

সরলা মুখ নীচু করিয়া কাঁদিতেছিল, সারদা ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “কাঁদছ কেন মা, তোমায় তো আমি কিছুই বলিনি, আমাদের ঘরের কথায়”—সরলা বাধা দিয়া কহিল, “আমার বড় যাতনা হচ্ছে মা।”

সারদা শশব্যস্তে কহিলেন, “তবে বুঝি প্রসব বেদনা হোয়েছে?”

সরলা উত্তর দিল না, সারদা তাড়াতাড়ি সময়োচিৎ বন্দোবস্ত করিয়া, নিদ্রিত বিজয়কে তুলিয়া ধাত্রী ডাকিতে পাঠাইলেন। সরলা মাতৃসমা সারদার প্রাণস্পর্শী স্নেহ-যত্নে, সে নিদারুণ যন্ত্রণার গুরুত্ব অধিক অনুভব করিল না, রাত্রি তিনটার সময় সে একটি তরুণ সুকুমার শিশু পুত্র প্রসব করিল, প্রসবান্তেই কিন্তু প্রসূতি অচৈতন্য হইয়া পড়িল, সারদা ভয় পাইলেন, অনেক চেষ্টাতেও সরলার জ্ঞান হইল না, তখন বিজয় গিয়া ডাক্তার আনিলেন।

ঔষধের গুণে সরলার চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু উহা নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আকস্মিক শেষ দীপ্তি মাত্র। যখন শুক তারা পূর্ব্বগগণে স্নিগ্ধোজ্জল জ্যোতি ছড়াইতে লাগিল, রজনীর অন্ধকার ছায়া, আকাশের গায় ধীরে ধীরে মিলাইতে সুরু হইল, বাতাস সমধিক স্নিগ্ধ হইয়া শিউলি ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া তুলিতে লাগিল; সেই সময়ে সরলার জ্ঞানোন্মেষ হইবামাত্র, চোখ মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, “মা, আমার ছেলে!” সারদা নবজাত শিশুকে সরলার মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, “এই যে মা, ঠিক্ যেন ফোটা পদ্ম-

ফুলটি। আজ তুমি বড় কাহিল হয়ে পড়েছ, কাল একটু সুস্থ হোয়ে কোলে নিও। বড় কষ্টের নাড়ী ছেঁড়া ধন মা, কোলে নিলে, তখন সব কষ্ট ভুলে যেতে হয়।"

সরলার মলিন অধরে একটু হাসির আভাস দেখা গেল, সে কহিল, "একবার ওকে আমার মুখের কাছে এনে দাও মা, একটা চুমো খাই, আর আমার বুকের ওপর একবার ওকে ছুঁইয়ে দাও মা, বুকের ভেতর বড় অশান্ত-জ্বালা, একটু যদি এ সময় ঠাণ্ডা হয়।" হায়! সন্তানবতী রমণীই জানে, সন্তান তার কত কষ্টের ধন, কত আদরের জিনিষ। প্রসবান্তে নারী যখন নবজীবন লাভ করে, তখন সে নবজাত পুত্রের মুখ দেখিয়া স্পর্শ সুখ লাভ করিয়া, মুহূর্ত্তে সকল যন্ত্রণা, সকল ব্যথা ভুলিয়া, অতুল আনন্দ পায়।

সারদা সন্তানের জননী, সরলার মনোভাব বুঝিয়া মমতার্দ্র হৃদয়ে তিনি তখন শিশুকে সরলার বুকের উপর স্পর্শ করাইয়া সরলার মুখের কাছে লইয়া গেলেন, সরলা প্রাণপণ চেষ্টায় শিশুর পুষ্পতুল্যমুখে একটী চুমা লইল, তার পর পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মা, আমার এ জন্মের সত্যিকারের মা না হোলেও আর জন্মে তুমিই আমার গর্ভধারিণী মা ছিলে, এখন আমার এ লজ্জার ভার তোমাকেই গ্রহণ ক'রতে হবে. বাবাকে বোলো মা, এ কলঙ্কিনীর লজ্জার ভার যখন তিনি স্বচ্ছন্দমনে ঘরে তুলে এনেছিলেন, তখন এ বোঝা তাঁকেই বইতে হবে, আমি চল্লুম মা, যার জন্যে এ তুচ্ছ প্রাণ, এত পীড়ন সহ্য ক'রেও রেখেছিলুম, তাকে যে বুকে ক'রে মানুষ ক'রতে পারলুম না, তার জন্যে কাঁটার বেদনা বুকে নিয়েই চল্লুম, কিন্তু মানুষের তো হাত নয় মা! দুঃখিনীর

ছেলেকে আজ যেমন আদর ক'রে স্বচ্ছন্দমনে কোলে তুলে নিয়েছ, এমনিই চিরদিন নিয়ো।"

সারদা চমকিয়া ব্যস্তভাবে কহিলেন, "ছিঃ—মা, ওকথা কি ব'লতে আছে? কালই তুমি ভাল হ'য়ে যাবে। তোমার ছেলে তোমারই কোলে মানুষ হ'য়ে উঠবে, অলক্ষণে কথা ভাবতে নেই।"

সরলা উত্তর দিল না। প্রভাতের পাখী উষার বন্দনা-গীতি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই সরলার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত মুগ্ধ আকাশে উড়িয়া পলাইল। সারদার কাতর মিনতি, ও অজস্র অশ্রুজল, নবজাতশিশুর মাতৃস্তন্য-পিপাসু-ক্রন্দন, কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

১৭

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই পল্লীগ্রামের গৃহে গৃহে নবান্নের বড় ধূম। প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়াতেই বৌ-ঝিরা ঢেঁকিতে ধপাধপ্ পা দিয়া সরু নূতন চাউল ভানিতেছে, ছুতারদের বাড়াতে নূতন ধানের চিঁড়া কোটার বিরাম নাই। দই, দুধ, মাছের কদর বড় বাড়িয়া গিয়াছে, যাহার যেমন অবস্থা, সাধ্যানুসারে সে সেইরূপ নবান্নের উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। কলিকাতার লোকও এ উৎসব করে, কিন্তু পল্লীগ্রামের উৎসবে বিভিন্নতা আছে। কলিকাতায় ঠাকুর বাড়ীতে একখানা নৈবেদ্য পাঠাইয়া ও নূতন চাউল, নূতন গুড়, পাঁচ রকম ফল মূল দুগ্ধ সহযোগে মিশাইয়া বাড়ীর সকলে খাইয়া উৎসবের মান রক্ষা করে; অবশ্য সে দিন নূতন আতপ চাউলের পায়সও রান্না হয়, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে রীতিমত পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবাসী সকলকেই

খাওয়াইতে হয়, দরিদ্র, গৃহস্থ, ধনী সকলেই মহানন্দে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। বিজয়দের গ্রামে দুই তিন বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হইতেছে, সুতরাং ঢাক-ঢোলের শব্দে পল্লী মুখর হইয়া উঠিয়াছে, পাড়ার ইতর, ভদ্র, ছেলে-মেয়েদের আনন্দ দেখে কে? বিজয়ের গৃহেও প্রতি বৎসর নবান্নের উৎসব স্বল্লায়োজনেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু এবারে তিনি কিছু জমি লইয়া চাষ করিয়েছেন, ফসলও মন্দ হয় নাই, কাজেই সারদা একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়া পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আহা, পাড়ার পাঁচজন বাড়ীতে আসিয়া পাত পাড়িয়া খাইবে, সে কত না ভাগ্যের কথা! বেলা চারিটার সময় নিমন্ত্রিত সকলেই আহারাদি সারিয়া চলিয়া গিয়াছে, সারদা সমস্ত দিনের পর এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়া, দুঃখীকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইতে ও তেল কাজল দিতে বসিয়াছেন। সরলার মৃত্যু সময়ের দান বলিয়া বিজয় শিশুর নাম রাখিয়াছেন দানু, ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতাকে হারাইয়াছে, সেজন্য সারদা নাম রাখিয়াছে দুঃখীরাম। সারদা যেন সতীশের শৈশবকে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইয়াছেন, সুতরাং তাহাকে দুধ খাওয়াইতে, তেল মাখাইতে, কোলে লইতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, মাতৃহীন হইয়াও দুঃখীরামের কোন অভাব, কোন দুঃখই নাই। তিনমাস বয়স পূর্ণ না হইতেই, পৃথিবীর হাসি-কান্নার সে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, গোলাপের পাপড়ীর মত রাঙা কচি ঠোঁট দু'খানির হাসিতে সে সহজেই সকলের মন জিনিয়া লয়, কাজল পরা উজল চোখ দু'খানির চাহনিতে অনায়াসে সে অনেক কঠোর চিত্ত দ্রব করে। যাহারা এই পরের বালাইকে নিতান্ত কৃপার চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও বলাবলি করেন, "পোড়া কপালে ছেলের কি এতো

রূপ গো!" সারদা কিন্তু প্রাণ ঢালিয়া দুঃখীকে পালন করিতেছিলেন, এক একবার তাঁহার মনে হইত, সরলার কথা বুঝি স্বপ্নের মোহ বা ভুল মাত্র, দুঃখী যেন তাঁহার নিজেরই গর্ভের সন্তান, সতীশের মতন দশমাস দশদিন সেও যেন তাঁহার গর্ভে স্থান পাইয়াছিল। কখনও বা মনে হয়, সরলার কাছে বুঝি তিনি তাঁহার পরাণ-পুত্তলীকে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সে তাই ফিরাইয়া দিবার জন্যই আসিয়াছিল, হায় রে মায়ান্ধ মন!

দুঃখীকে যখন সারদা তেল মাখাইতে কাজল পরাইতে ব্যস্ত; সেই সময়ে সৌম্যমূর্ত্তি গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সারদা শশব্যস্তে মাথার, গায়ের কাপড় সামলাইয়া, দুঃখীকে কোলে লইয়াই উঠিয়া গিয়া গুরুদেবের পায়ের ধূলা লইলেন, গুরুদেব এক খানি চৌকি টানিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "থাক্ মা, অতো ব্যস্ত হোতে হবে না, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি, কল্যাণ হোক্। তা মা, শিশু কোলে তোমায় মানিয়েছে বেশ, নারীর কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু দেখ্‌লেই জগৎ-মাতার জগদ্ধাত্রী রূপ স্মরণ হয়। স্ত্রীলোকের মাতৃমূর্ত্তিতে যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, এমনটি আর কোনো মূর্ত্তিতে হয় না, সাক্ষাৎ যেন ভগবতী মূর্ত্তি।" সারদা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনার চোখে বাবা, সবই সুন্দর। তা আপনি এখন এসে পড়েছেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, বিয়ের দিন, মাসের প্রথমেই ঠিক হ'য়েছিল, তারপর তারাই আবার পেছিয়ে দিয়েছে। যাই হোক্ তা'তে ভালই হয়েছে। প্রথমে হোলে, আপনি উপস্থিত থাক্‌তেন না, আমারও মন খুঁৎ খুঁৎ ক'র্‌তো" গুরুদেব কহিলেন, "সবই হয়ে যাবে মা, কোনো চিন্তা নেই, ভাগ্যক্রমে ঘর বর খুবই ভালই জুটে গেছে, সবই

ভগবানের দয়া, তাঁর উপর নির্ভর কোরে থাক মা, কোনো চিন্তা নেই।"

সারদা কহিলেন, "সে তো বটেই বাবা, একটা মাত্র মেয়ে, কত দুঃখে কষ্টেই মানুষ করেছি, বিয়ের জন্যে যে ভাবনাটা হয়েছিল, তা আর কি বল্‌বো, এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আর ভগবনের দয়ায়, শুভ কাজটি ভালয় ভালয় সারা হলে বাঁচি, একখানি ভাল কাপড়, কি গয়না কখনো মেয়েকে দিতে পারিনি, এখন কালী করুন, সুপাত্রে প'ড়ে সুখে থাকুক।"

গুরুদেব কহিলেন, "তাই হবে মা, তাই হবে। সুখ শুধু ধনে নয় মা, মনের সুখেই আসল সুখ, মন খাঁটি থাক্‌লে সকল অবস্থাতেই শান্তি পাওয়া যায়।"

এই সময় প্রফুল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল, সারদাকে কহিল, "কাকী-মা, সকালে নেমন্তন্ন খেতে আস্‌তে পারি নি, চাটুয্যেদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেছ্‌লুম। জানি মনে, আপনার বাড়ীর ভাগটা ফাঁক যাবে না, রাত্রে এখানে খাব।"

সারদা কহিলেন, "তাই খাস্ বাবা, আমি কতবার তোর নাম করেছি, বলি, কেন এল না, তোর ভাই মণিকে জিজ্ঞেসা করলুম, সে ব'ললে—দাদা বাড়ীতেই নেই।"

প্রফুল্ল গুরুদেবকে প্রণাম করিতেই গুরুদেব কহিলেন, "পড়া শুনা হ'চ্ছে কেমন? এ বছর তোমার তো ফার্ষ্ট ইয়ার না? ক'ল্‌কাতায় আছ কোথা?" প্রফুল্ল কহিল, "কলেজের মেসে আছি, পড়া শুনা তো এক রকম ক'র্‌ছি, দু'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছি, কালই আবার যেতে হবে।" সারদা কহিলেন, "কিন্তু পুঁটির

বিয়েতে তোকে, পূর্ণেন্দুকে আস্‌তেই হবে, আমার এই একটি মাত্র কাজ, তা'তে তোরা না থাক্‌লে চল্‌বে না।”

প্রফুল্ল কহিল, “আস্‌বার খুবই চেষ্টা ক'র্‌বো কাকী-মা, পূর্ণ-দা বোধ হয় আস্‌বেই, তবে আমি এই দু'দিনের ছুটি নিয়েছি, আবার ছুটি পেলে হয়! তা, পুঁটি কই কাকী-মা?”

সারদা কহিলেন, “পুকুরে বুঝি গা ধুতে গেছে, তোরা বাবা আর পুঁটি বলে ডাকিস্‌ না, নির্ম্মলা বলিস্‌। আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, ভাল নামটা ঢাকা পড়ে গেছে, সেইটে বোলে সবাই ডাক্‌বি।”

প্রফুল্ল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “পুঁটির যে নির্ম্মলা নাম, সে তো মনেই হয় না, নির্ম্মলা বোলে ডাক্‌লে মনে হবে, আর কাউকেই যেন ডাক্‌ছি, তবে আপনি যখন বল্‌ছেন কাকী-মা, তখন দিন কতক না হয় মুখস্থ কোরে দেখ্‌ব, তা তোমার জামাই তো পাড়াগাঁয়ে জংলা ছেলে, পুঁটি নাম সে খুব পছন্দ ক'র্‌বে।” সতীশ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া “দাদাম'শাই” বলিয়া গুরুদেবের গলা জড়াইয়া ধরিল, পরক্ষণে ছুটিয়া প্রফুল্লর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, “প্রফুল্ল-দা, আমার ঘুঁড়িটা একটু উড়িয়ে দেবে চল না, বিশু ছোঁড়া কিছুতেই পার্‌ছে না।”

প্রফুল্ল সতীশের সহিত গিয়া পুকুর পাড়ে, ছোট বাগানটিতে দাঁড়াইয়া সতীশের ঘুঁড়িটা উড়াইয়া, লাটাই খানি সতীশের হাতে দিল, তারপর কল হাস্য ধ্বনিতে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, শোভা ও পুঁটি সাঁতার দিয়া পুকুর তোলপাড় করিতেছে। প্রফুল্ল ঘাটের ধারে গিয়া ডাকিল, “নির্ম্মলা?” শোভা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “নির্ম্মলা কে প্রফুল্ল-দা? এখানে তো পুঁটি আর আমি রয়েছি।”

প্রফুল্ল কহিল, "পুঁটিকেই জিজ্ঞেস কর্‌না, পুঁটি তো তাকে চেনে, এই মাসেই যে তার সঙ্গে শচীনের বিয়ে হবে।"

শোভা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, পুঁটির বড় রাগ হইল, সে কিন্তু চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয় বিবেচনায় মোটেই কথা কহিল না, এমন সময় শোভাদের ঝি ও দিকের পুকুর পাড়ে আসিয়া ডাকিল, "অঃ দিদিমণি! সেই কোনকাল থেকে পুকুরে গা ধুতে নেমেছ, তা এখনও কি গা ধোয়া হোলো না? গিন্নি-মা, আমায় শুদ্ধু বকাবকি ক'র্‌ছেন, আমি আর কতবার হাঁকাহাঁকি কর্‌বো, আমার তো আরও পাঁচ খানা কাজ আছে, এই জাড়ের দিনে ঠাণ্ডা জলে গা ডুবিয়ে এতও তোমরা থাক্‌তে পার, পায়ে তোমাদের গড় করি মা, এখন উঠে এস।"

ঝিএর কথার ঝাঁজ শুনিয়া, মাতার বকুনির ভয়ে, শোভা তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া ঘরে চলিল, পুঁটিও ঘাটে উঠিয়া ছোট পিতলের কলসীটি জলে ভরিয়া তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছে; প্রফুল্ল আসিয়া পথ আগলাইয়া কহিল, "নির্ম্মলার সঙ্গে শচীনের বিয়ে হবে বলেছি বলে তোর বুঝি হিংসে হয়েছে, তাই রাগে কথা কইচিস্ না! আচ্ছা, আমি বলি কি, নির্ম্মলার সঙ্গে শচীনের বিয়ে হোক্, আর তোকে আমি বিয়ে করি।"

পুঁটি রাগে গর্‌গর্ করিতে লাগিল, কোনো উত্তর দিল না। প্রফুল্ল আবার কহিল, "ভ্যাখ্ পুঁটি, এখনও রাজী হোস্ তো কাকী-মাকে ব'লে দেখি।" পুঁটি লজ্জায়, রাগে, কৌতুকে কেমন হইয়া গিয়া, প্রফুল্লর গায়ে এক অঞ্জলি জল ছুঁড়িয়া মারিয়া দ্রুতপদে গৃহে পলাইল, যাইতে যাইতে ভাবিল, "প্রফুল্ল-দা'টা আস্ত পাগল!"

১৮

নিবারণ বাবুর কন্যা সুজাতা আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ; পূর্ণেন্দু তাহার পাঠ প্রস্তুত করাইয়া দিতেছে। নিবারণ বাবুর তিনটি উপযুক্ত পুত্র এক বৎসরের ভিতর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রী সুলোচনা সেই শোকে নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। নিবারণ বাবু ব্রাহ্ম, তিনি অত্যন্ত ভগবদ্ বিশ্বাসী, ঈশ্বরের চরণে চাহিয়া, ভীষণ পুত্রশোক খুব ধীর ভাবেই সম্বরণ করিয়াছেন, একটি মাত্র কন্যা সুজাতাকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত পালন করিতেছেন। পূর্ণেন্দু যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়, সেই সময় নিবারণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার আলাপ হয়, সে ছেলেটি পূর্ণেন্দুর সমপাঠী ছিল, আলাপ, ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইল এবং তাহার ও নিবারণ বাবুর আগ্রহে পূর্ণেন্দু নিবারণ বাবুর গৃহে থাকিয়াই পড়া শুনা করিতে লাগিল। কয় বৎসর সে এই পরিবারেই বাস করিয়া ইহাদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়া গিয়াছে। নিবারণ বাবুর তিনটি পুত্রেরই পীড়া-শয্যায় পূর্ণেন্দু প্রাণপণ যত্নে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। যদিও সে সেবা সার্থক হয় নাই, কিন্তু কৃতজ্ঞ দম্পতী তাহা একদিনের জন্য ভোলেন নাই, পূর্ণেন্দুকে তাহারা পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন করেন। ব্রাহ্ম পরিবারে এতদিন ধরিয়া বাস করিয়াও সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন ছেলেকে এত-খানি আত্মীয়ের স্থান দেওয়ার জন্য তাঁহারা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগের নিকট মৃদু তিরস্কার বাণীও শুনিয়া থাকেন, সুলোচনা সে সব গ্রাহ্যই করেন না, তবে নিবারণ বাবু গোঁড়া ব্রাহ্ম, তিনি পূর্ণেন্দুকে খুবই ভালবাসেন, সেজন্য তাহার আধ্যাত্মিক মঙ্গল

চিন্তা করেন। পূর্ণেন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু উদাসীন বলিয়া তিনি একটু বিশেষ রকম দুঃখিত।

সে দিন দুপুর বেলা পূর্ণেন্দু যখন সুজাতাকে পাঠ বলিয়া দিতেছিল, সেই সময় সুজাতার সহপাঠিনী রমলা ও মাধুরী আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ণেন্দুর সহিত তাহাদিগের আলাপ ছিল, পূর্ণেন্দুকে নমস্কার করিয়া উভয়ে গিয়া সখীর পাশে বসিল, মাধুরী কহিল, "সুজাতা, আজ বোর্ডিংএর মেয়েদের নিয়ে মিস্ মৈত্র বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাচ্ছেন, আমাদের খবর পাঠিয়েছেন, আমরা যাব, তোমাকেও নিতে এলুম।"

সুজাতা কহিল, "না আমার আজ যাওয়া হবে না, তোমরা যাও, আমি আজ এই পড়াটা তৈরী কোরে নিই।" মাধুরী কহিল, "ইস্, পড়াতো আর আমাদের নেই! পূর্ণেন্দু-বাবু, আপনার ছাত্রীকে আজ ছুটী দিতে হচ্ছে।" পূর্ণেন্দু কহিল, "ছুটি দেওয়া, নেওয়া আপনাদেরই নিজেরই হাতে। সুজাতা, ওরা যখন অনুরোধ ক'রছেন, তখন তুমি যাও, রাত্রে আমি তোমায় পড়িয়ে দোব।" সুজাতা কহিল, "আপনি পরশু দিন বাড়ী যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে বেড়ান বন্ধ কোরে পড়াটা আমার মুখস্থ কোরে নেওয়া চাই, রাত্রে আপনি নিজের পড়া বন্ধ কোরে আমায় পড়াবেন, সে কি হয়? বাবাও তাতে রাগ ক'রবেন।"

রমলা সুজাতার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "কি দরদ তোর, উনি যখন যেচে কষ্ট স্বীকার ক'রছেন, তখন তোর আবার অতো লৌকতা কেন?"

সুজাতা পীড়াপীড়ীকে এড়াইতে পারিত না, অগত্যা মাতার হুকুম লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্ণেন্দুকে কহিল, "আপনি বসুন,

পূর্ণ-দা, আমি মাকে জিজ্ঞেসা কোরে আসি, তিনি বলেন তো যাব ; নইলে এখুনি পড়াটা শেষ কোরে নেব।"

রমলা ও মাধুরী সঙ্গে যাইবার জন্ম চলিল, এমন সময় 'পূর্ণ-দা' বলিয়া প্রফুল্ল আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পূর্ণর সঙ্গে দেখা-শুনা করার উপলক্ষে প্রফুল্ল মধ্যে মধ্যে এখানে আসা যাওয়া করে, সুজাতার সহিতও তাহার আলাপ হইয়াছে, স্নেহময়ী সুলোচনা—পূর্ণেন্দুর বন্ধু বলিয়া প্রফুল্লকেও স্নেহ করেন, প্রফুল্ল কিন্তু রমলা ও মাধুরীকে কখনও দেখে নাই, সুতরাং অপ্রস্তুত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু তার কৌতুহলী দৃষ্টি বারবার অপরিচিতা তরুণী দু'টির মুখের উপর পড়িতে লাগিল। সুজাতা কহিল, "আপনি এসে বসুন প্রফুল্ল বাবু, আয় রমলা, মায়ের কাছে যাই।"—বলিয়া সুজাতা সখীদের লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে মাধুরী কহিল, "সুজাতা, এ ছেলেটি আবার কে ভাই? কখনও যেন মেয়েদের দেখেনি, চশমার ভেতর থেকে চোখ দু'টো যেন ঠিক্‌রে প'ড়ছিল, কি অসভ্যর মতন চেয়ে দেখ্‌ছিল. দেখেছিস্?"

সুজাতা কহিল, "ভগবান চোখ দিয়েছেন, তা দেখ্‌বে না? তার ওপর যে সেজেগুজে তোরা এসেছিস্!" মাধুরী সুজাতাকে ছোট একটি চাপড় মারিয়া কহিল, "তা ব'লে তোকে আজ সাদা ধুতি প'রে যেতে দিচ্ছি না, তোর সেই তুঁতে রঙের রেশমী সাড়ী আর ব্লাউস আজ পরিয়ে দেবই, তার উপর তোব কোঁক্‌ড়া চুল গুলো এলিয়ে দিলে কি সুন্দর দেখাবে!"

এদিকে প্রফুল্ল ঘরে আসিয়া পূর্ণেন্দুর পাশে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বাস্ রে, কি এসেন্সের গন্ধ, আর শাড়ী, জামার বাহারই

বা কি! কাপড় যে গাউনকে ছাড়িয়ে গেছে, তিন্‌-তিনটে মেয়ের মাঝখানে ব'সে তুমি কি ক'রছিলে পূর্ণ-দা? এঁদের তো দেখ্‌লে আমার ভয় হয়, এক একজন পুরো মেম সাহেব।"

পূর্ণেন্দু হাসিয়া কহিল, "সুজাতার পড়া ব'লে দিচ্ছিলুম ও হু'টি মেয়ে সুজাতারই ক্লাস ফ্রেণ্ড, ওরা সব বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাবে, তাই সুজাতাকে ডাক্‌তে এসেছে।"

প্রফুল্ল কহিল, "যাই বল পূর্ণ-দা, এঁদের তো দেখে আমার ভয় হয়।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "কিরকম?"

প্রফুল্ল কহিল, "কি জানি, এত বড় বড় মেয়ে, চোখে চশমা, কলেজে প'ড়্‌ছে, জামা কাপড়ের এই সব বাহার, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে এসব মেয়ে থাক্‌লে তো চক্ষু স্থির!"

পূর্ণেন্দু হাসিয়া কহিল, "তোমার কিরকম idea তা তো বুঝ্‌ছি না, এরাও সাধারণ গেরস্ত ঘরেরই মেয়ে, ঘরের কাজ কর্ম্ম, বাপ মার সেবা, সময় মত সবই করে, আবার চশমা চোখে দিয়ে কলেজেও প'ড়তে যায়, ঘরে ছেঁড়া জামা কাপড়ও পরে, আবার বাইরে যাবার সময় বেশ ভূষাও করে।"

প্রফুল্ল কহিল, "আবার ইংরিজীতে কড়্‌ফড়্‌ ক'রে কথাও বলে, শেলিমিণ্টনও আওড়ায়।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "তা কি তুমি আমি আওড়াই না? ওদের বেলাতেই বা দোষ কিসের?"

প্রফুল্ল কহিল, "তুমি যাই বল দাদা, হিন্দুর ঘরের মেয়েদের মতন নরম সরম ভাব, লাজ লজ্জা কিছুই এদের নেই, সব যেন ঘোড়ায় চড়া—সঙ্গীন ধরা। নমস্কার এসব মেয়েদের পায়ে।"

ইতিমধ্যে তিন সখীতে আবার ফিরিয়া আসিল, সুজাতাকে জোর করিয়া মাধুরী তাহার তুঁতে রঙের রেশমের শাড়ীটি পরাইয়া দিয়াছে, সুজাতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উহাতে যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, মাধুরী পূর্ণেন্দুকে কহিল, "আপনার ছাত্রীকে আমরা ধ'রে বেঁধে নিয়ে চ'ললুম, তবে পড়াটা আপনি নিশ্চয় তৈরী ক'রে দেবেন, নইলে আমাদের জরিমানা ক'রবে, ও তো যেতেই চাইছিল না।"—বলিয়া নমস্কার করিয়া তিনজনেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল: প্রফুল্ল অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া কহিল, "বাস্‌রে, কি সাজ-গোজের ধূম! পায়ের জুতোর শব্দই বা কি? তোমাকে আবার কেমন হুকুমের সুরে কথাগুলি শুনিয়ে গেল, আমার তো শুনে গা জ্বালা ক'রছে।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "বাসায় গিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে মিছরির সরবৎ খেয়ো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

বর বেশে সজ্জিত শচীনের চিবুকে স্নেহভরে হাত দিয়া বরদা কহিলেন, "বল বাবা, মা! তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।"

শচীন আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।" সৌদামিনীর দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা নামিল, তিনি ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "আজকের দিনে আর যে আমি বুকের ব্যথা চেপে রাখতে পারছি না, তিনি আজ কোথায় রইলেন, শচী, তুই আমার বড় দুঃখের ধন রে, অন্ধের যষ্ঠি, আমার গোপাল!" শচী

নত হইয়া মায়ের পায়ে হাত দিয়া কহিল, "মা, আমি কোথাও তোমার দাসী আন্‌তে যাব না, তোমার সব কাজ আমি নিজের হাতে ক'রে দেব, তুমি আমি এ বেশ আছি মা, এর মাঝখানে আর কাউকে এনে দরকার নেই।"

বরদা সৌদামিনীর শোকের আতিশয্যে একটু বিরক্ত হইলেন, ছেলে কি কারও বিবাহ করিতে যায় না? সবারই কি বাপ মা বর্ত্তমান থাকে? শুভলগ্নে শুভক্ষণে যাত্রা হইতেছে, বিশেষ ট্রেণের পথে যাইবে, সুতরাং তিনি কহিলেন, "বউ তুমি এসময়ে চোখের জল ফেলে ছেলের মন খারাপ ক'রে দাও কেন? ওতে যে ছেলের অকল্যাণ হবে। শচীন, বাপ, তুমি সুবুদ্ধি ছেলে, তোমার এত অধৈর্য্য হওয়া কি ভাল দেখায়?" মুহূর্ত্তে সৌদামিনী আত্মসম্বরণ করিয়া সময়োচিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া লোকজন সঙ্গে ছেলেকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার কেবলই যেন মনে হইতে লাগিল, বুক বুঝি খালি হইয়া গেল, বিহঙ্গ-শূন্য পিঞ্জরের ন্যায় দেহখানি পড়িয়া আছে, প্রাণ মন শচীনের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। ছেলেকে বিবাহ করিতে পাঠাইয়া মায়ের বুক কি এমনি করিয়া শূন্য হইয়া যায়; কিম্বা স্বামী শোকে আজ তাঁহার চিত্ত এমনি উন্মনা হইয়া পড়িয়াছে!

যে চিন্তা যে স্মৃতিকে সৌদামিনী বার বার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, মনোরাজ্যের ত্রিসীমানা হইতে যাহারা বহিষ্কৃত, বিসর্জ্জিত, আজ সময় বুঝিয়া সেই দুশ্চিন্তাগুলা ঐ যে দুঃস্বপ্নের মত মাথা ঝাড়া দিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, কত কত বৎসর আগেকার সেই সুদূর অতীতকালে কথিত সাধুর অতি নিষ্করুণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী! ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সৌদামিনী

চক্ষু বুজিলেন, কি বিকট সে চিন্তা! সে যেন আজ দশ দিকে মূর্ত্তি ধরিয়া, সৌদামিনীর চারিদিক ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিল। একাকিনী নিজের গৃহে ভূমি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকিলেন, "ওমা দুর্গে দুর্গতি হারিণী, অভাগিনীর বাছাকে রক্ষা কর মা, বুক চিরে তোমায় রক্ত দেব, তুমি জগৎমাতা জগদ্ধাত্রী হ'য়ে মায়ের বুকে ছুরি বসিও না মা, আমার সবে ধন নীলমণিকে রক্ষা ক'রো তারা।"

বরদা সৌদামিনীকে কাতর দেখিয়া, সে রাত্রি তাঁহারই কাছে রহিলেন। বিজয়, কন্যার বিবাহে বরদাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌদামিনীর গৃহের কাজ বরদা না থাকিলে কিছুতেই চলিবে না, সেজন্য বরদা যাইতে পারেন নাই। মধ্য রাত্রে সৌদামিনী হঠাৎ অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, বরদা ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকাইলেন, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "ভয় নেই, মানসিক উত্তেজনার জন্যে এ রকম হয়েছে, একটা ওষুধ দিচ্ছি, এইটে খাইয়ে দিন, আর কিছু দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করুন।"

ভোরের সময় সৌদামিনীর চৈতন্য হইল, জ্ঞান হইবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "আয় শচীন, একবার কোলে নিই।" বরদা মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "বউ ছেলেকে বিয়ে ক'রতে পাঠিয়ে একি পাগলামী সুরু করেছ! রাত পোহালে গাড়ীতে বর ক'নে আস্‌ছে, তুমি এমনি হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌লে বউ বেটা বরণ ক'রে ঘরে তুলবে কে? ঘরে লোক কুটুম্বদের আদর অভ্যর্থনা করবেই বা কে?" পরদিন বৈকালের ট্রেণে বর কন্যা আসিবার কথা, কিন্তু

হঠাৎ সকাল সাতটার ট্রেণে বিজয়কে আলু-থালু বেশে রুক্ষ-মূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়া বরদা দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন হঠাৎ এলে বিজয়? শচী কই, পুঁটি কই? খবর সব ভাল তো?"

বিজয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "বেশী কিছু জিজ্ঞেস কোরো না দিদি, কথা বল্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত আর নেই, তবু যে কলের পুতুলের মতন এখনো চলা ফেরা ক'রছি এইটেই আশ্চর্য্য। বিয়ের পর, বাসর ঘরে বারটা রাত্রে শচীনকে হঠাৎ সাপে কাম্‌ড়েছে, সে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে আছে, আমি তখুনি সেখানকার ভার গুরুদেব আর রজনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে, সেই ট্রেণে শচীর মাকে নেবার জন্যে চলে এসেছি।"

বরদার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বিবশার ন্যায় বসিয়া পড়িয়া তিনি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধভাবে, শূন্য দৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কথাগুলি হঠাৎ একটি প্রবল আঘাতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে এমন জোরে আঘাত করিল; যাহার চাপে তাঁহার অনুভব শক্তি পর্য্যন্ত নিষ্পেষিত হইয়া গেল। কথার শব্দগুলো যেন হুড়ামুড়ি করিয়া উল্টা পাল্টা হইয়া তাঁহার কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিল, সে জন্য সহসা তিনি উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তারপর ধীরে ধীরে শব্দগুলি সুসংবদ্ধ হইয়া যথারীতিভাবে যখন তাঁহাকে সংবাদটি বুঝাইয়া দিল, বরদা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল, এ বুঝি ঠিক তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা নয়, হয় তো তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার চিত্তবিকার ঘটিয়াছে, আর নয় তো বিজয়েরই মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে, তখন তিনি চীৎকার করিয়া

কহিলেন, "বিজয়, তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমার চেহারা দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে, তুমি কি বুঝ্‌তে পারছ, যে তুমি কি বলছ?"

বিজয় দুই হাতে নিজের মাথার চুলগুলি টানিতে টানিতে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বল্‌ছি আমার মাথা, আর মুণ্ডু। পাগল যদি হ'তাম, ভালই ছিল, প্রতি পদে পৃথিবীর নিষ্ঠুর আঘাত আমায় এমন কোরে ঘা দিতে পার্‌তো না।"

"কাঁদ্‌বার দিন, শোক কর্‌বার দিন এখন প'ড়ে আছে দিদি, সমস্ত জীবন বোসে আমরা চোখের জল ফেল্‌তে পার্‌ব, এখন তার সময় নয়, এখন একবার শুধু শচীর মাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই, দুই অভাগিনীতে প'ড়ে তার অচেতন দেহের কাছে আর্ত্তনাদ ক'র্‌বে, যদি তাতে শচীর সংজ্ঞা ফিরে আসে, যদি সে করুণ আর্ত্ত-স্বর শুনে, নিষ্কামি ভাগ্য-দেবতার হৃদয় বিগলিত হয়, বিধাতার একি নিষ্ঠুর বিধান, তা বুঝতে পার্‌লুম না, কোন পাপে তিনি এতো কষ্ট দিতে চান্!"

২০

নব-রবির সোনালী ধারায়, হেমন্তের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শান্ত ধরাতল ভরিয়া গিয়াছে। ধানের ক্ষেত্রে মৃদু সমীর হিল্লোলে সোণার রঙের ঢেউ খেলিতেছে, ফলভরে নমিত ধান্য-শীষ গুলি ঈষৎ বায়ু ভরেই কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া দুলিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, হাঁসের পাল স্বচ্ছন্দ মনে পরমোৎসাহে ক্ষেতের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আশ মিটাইয়া পাকা ধান খুঁটিয়া খাইতেছে, উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য একজনও চাষী এখনো ক্ষেতে আসিয়া দেখা দেয়

নাই, যে হেতু দলে দলে সবাই আজ নিজেদের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া বিজয়ের গৃহের উদ্দেশে ছুটিয়াছে।

আজিকার তরুণ উষালোক সবারই চোখে নিতান্তই ম্লান, শোকের কাল ছায়া যেন সারা গ্রাম খানির বুক জুড়িয়া নামিয়াছে, বিজয়ের গৃহে, ইতর, ভদ্র নর-নারী, যুবা, শিশু সকলেই সর্পাঘাতে মৃত শচীনকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। ঘরে, দালানে আঙিনায় লোকে পরিপূর্ণ। রজনী, যামিনী অনেক চেষ্টাতেও ভিড় সরাইতে পারিতেছেন না, অবশেষে নিতাই বহু চেষ্টায় বাহিরের লোকজন সরাইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, দুইজন সাপের ওঝা আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঝাড়্ ফুক্ করিয়াছে, কিন্তু হায়! সমস্তই বৃথা। বেলা এগারটার ট্রেণে সৌদামিনীকে লইয়া বিজয় আসিয়া পৌছিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া ভূলুণ্ঠিতা সারদা দ্বিগুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সৌদামিনী কিন্তু অকম্পিত পদে মৃত পুত্রের নিকট গিয়া, সেই প্রাণহীন দেহ কোলে করিয়া, হিম-শীতল ললাটে চুম্বন করিয়া বিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন, "শচীন্! সর্ব্বস্ব ধন, অন্ধের মাণ, একবার মায়ের ডাকে সাড়া দে বাপ্, আমি যে তোকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি!"

সমবেত পুরুষগণও সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমণীর ন্যায় বিহ্বল ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে রজনী গুরুদেবের কাছে গিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, আপনি সর্প চিকিৎসা খুব ভাল রকমই জানেন, শুনেছি, সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তি সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত বিষে আচ্ছন্ন থেকে মৃতের মতন বোধ হয়, অনেকে তার মধ্যে পুনর্জ্জীবন ও লাভ করে, এ ক্ষেত্রে সে রকম কিছুরই কি আশা নেই?"

গুরুদেব বিরস মুখে কহিলেন, "না বৎস, সে আশা বৃথা, শচীনকে যে ভয়ানক কালসাপ দংশন করেছে, মূহূর্ত্তে তার প্রাণ ঘাতী বিষে ওর সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়েছে। আমার সাধ্য মত চিকিৎসা আমি করেছি, রোজারা ও যথাসাধ্য ঝাড়্ ফুঁক্ ক'রলে, তোমাদের ডাক্তাররা ও নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি সবই প্রয়োগ ক'রে দেখ্‌লে, কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ, অনেকদিন সংসার ছেড়ে, সাংসারিক শোক দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়েছিলাম রজনী, কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে শচীনের এই অপমৃত্যু আমায় বড় দাগা দিলে।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুরুদেব চুপ করিলেন।

রজনী তখন উপস্থিত কর্ত্তব্য—মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন, ভাগ্যক্রমে পূর্ণেন্দু বিবাহোৎসবে আসিয়া জুটিয়াছিল, সে সতীশ ও দুঃখীকে লইয়া বাসায় রাখিতে গিয়াছে। সারদা আলু-থালু বেশে পাগলিনীর ন্যায় মাটিতে লুটাইতেছেন, বিজয় স্তম্ভিতের ন্যায় মাথায় হাত দিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন, দৃষ্টি সম্পূর্ণ উদাস, লক্ষ্যহীন। সৌদামিনী মূর্ত্তিমতী শোকের ন্যায়, নিশ্চল প্রস্তরময়ী প্রতিমার মত পুত্রের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁর চক্ষু অশ্রু-শূন্য, বুঝি বা দৃষ্টি পলকহীন। আর অভাগিনী পুঁটি,—বধূবেশে সে এখনও সুসজ্জিতা। লাল বেনারসী শাড়ী, বহু মূল্য হীরক রত্নালঙ্কার, তাহার দুর্ভাগ্য ঘোষণা করিবার জন্যই বুঝি তাহাকে অতো সুন্দর দেখাইতেছিল, কপালের চন্দন-বিন্দু গুলি এখনও মুছিয়া যায় নাই, সীমন্তের রক্ত-সিন্দুর জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, পায়ের আল্‌তা টক্ টক্ করিতেছে, অম্লান বধূবেশ তাহার সর্ব্ব

দেহে সমুজ্জ্বল থাকিতেই সে বিধবা হইল, একি নিষ্ঠুর ভাগ্য চক্র! শোভা, ভূতি, প্রভৃতি সঙ্গিনীগণ বিবাহের নিমন্ত্রণে আসিয়া, সহসা সখীর এ অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ে, ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল: মাতৃগণের তাড়নায় তাহারা আর সখী সন্নিধানে যাইতে সাহস করে নাই, গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে, হায় হায়, সে যে বিবাহের রাত্রে বিধবা হইল, তার ন্যায় অভিশপ্তার সঙ্গ যে অন্য কোনো কুমারী বা সধবা নারীর এখন সর্ব্বথা পরিহার্য্যা, তার ছায়া কি আর এখন মাড়াইতে আছে? পুঁটির সালঙ্কারা বধূবেশ আজ সবারই চক্ষে বিভীষিকাময়ী দুর্ভাগ্যের প্রেত-ছায়ার মত মনে হইতেছিল।

মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করিয়া, যখন সকলে শচীনের শব লইবার জন্য সৌদামিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অথচ সাহস করিয়া একটি কথাও মুখ ফুটিয়া কেহ বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তখন সৌদামিনী ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "কি নিতে এসেছ? আমার বুকের ক'লজে? আমার পাঁজরার হাড়? আমার চোখের জ্যোতি? আমার সর্ব্বস্ব? বেশ, নিয়ে যাও! আমি বাধা দেব, ভয় ক'র্‌ছ? কিছু না, যম যখন ফাঁকী দিয়ে আসল জিনিষ নিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন জড় দেহটা নিয়ে আমি কি করব? তবে এই দেহেতেই তার প্রাণ এতদিন বাস ক'রেছিল, সেই মায়াতেই এতক্ষণ আঁকড়ে ধোরে বোসেছিলাম, কিন্তু আর কেন? তবে একটু দাঁড়াও, বাছার কপালের চন্দন-ফোঁটা, যা কাল আসবার সময় যত্ন ক'রে আমি পরিয়ে দিয়েছিলুম, তা মুছে গেছে, গলার ফুলের মালা, শুকিয়ে গিয়ে বাছার আমার ফুলের মতন কোমল দেহে, বড্ড বেমানান্ দেখাচ্ছে, তোমরা চন্দন আন, টাট্‌কা ফুলের মালায় আমার যাদুকে সাজিয়ে দাও, আমার শচী

আমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছে যে।"

শচীর মৃতদেহ চন্দন পুষ্পে সজ্জিত হইলে পর, সৌদামিনী বার বার মৃতের ভুক্তি-শীতল, নীলবর্ণ ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া কহিলেন, "এত ঘুম কেন বাপ, কোথায় যাচ্ছিস্? আর একবার চাঁদ মুখে বল্ শুনি, আমার দাসী আনতে যাচ্ছিস্—কি তাঁর কাছে চল্লি, তিনি বুঝি তোকে ডাকছেন? এতদিনে ছেলেকে তাঁর মনে পড়েছে কি? আমায় কি তিনি দাসী বোলে আর স্মরণ ক'র্লেন না?"

কয়েকজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক সৌদামিনীকে তুলিয়া সরাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু এ করুণ দৃশ্যে সকলেই বিকারের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল, কে সান্ত্বনা দেয়? সকলেই তো সন্তানের মা, সুতরাং এ শোকের গুরুত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে সবাই বুঝিতেছেন, অগত্যা গুরুদেব অগ্রসর হইয়া আসিয়া সৌদামিনীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "মা গো, স'রে আয় মা, যদিও তোকে আজ সান্ত্বনা দেবার মত একটি কথাও সম্বল নেই, তবু বলি, এ জগতে শোক তাপের হাত এড়াতে কে পারে?"

সৌদামিনী সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইত্যবসরে সকলে শব লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সৌদামিনী গুরুদেবের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আপনি সবার গুরুদেব, আপনি জ্ঞানী, আপনার কত গুণ গান সকলের মুখে শুনে আস্‌ছি, আপনি আজ এই অজ্ঞান নারীকে বুঝিয়ে দিন, এ পৃথিবীতে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, মাতা পুত্রের সম্বন্ধ, যা এত পবিত্র, এত মধুর, তা কি শুধু নিতান্ত ক্ষণিক, কি নিত্য-কালের! বুঝিয়ে দিন প্রভু, আমার শচী, আমার দুলাল—যাকে

এত বৎসর ধ'রে বুকে রেখে মানুষ করলুম, সে একমুহূর্ত্তে কার ডাকে কোথায় চ'লে গেল! একবার আমায় ব'লেও গেল না? তার ওপর কি আমার এতটুকু দাবী.দাওয়া নেই, তবে এ মাতৃস্নেহের মূল্য কি বলুন? আর যদি বলেন, বিধাতার ইচ্ছা, তাহ'লে বুঝিয়ে দিন, যে বিধাতাকে পরম করুণাময় ব'লে জানছি; তাঁর একি নিষ্ঠুর বিধি যে অকালে মায়ের বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে এমন ভীষণ শোকের আগুন বুকে জ্বেলে দিচ্ছেন? তিনি অন্তর্য্যামী, এ জ্বালার ব্যথা তো তাঁর অগোচরে নয়!"

পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিতেছিল, "ও মা, তোমার পায় পড়ি, একবার ওঠ মা, আমার বুকের ভেতর বড্ড যে কেমন ক'রছে, একবার ওঠ মা।" সারদা একবার কন্যার দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে পদাঘাতে কন্যাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আঃ হতভাগী, খুলে ফেল্ তোর সাজ-সজ্জা, মাথার সিঁদুর মুছে ফেল্ কালামুখী, গয়নার রাশি, বেনারসী শাড়ী এখনও প'রে আছিস্? দূর হ পোড়াকপালী আমার সুমুখ থেকে, ও অলক্ষুণে মুখ, লোকালয়ে আর কাউকে দেখাস্নি। পোড়া সাপ তোকে খেলে না কেন?"

পুঁটি আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেল, কাছে একটা পিতলের থালা ছিল, তাহার কাণা লাগিয়া কপাল কাটিয়া দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল, দুঃখিনী বালিকা চক্ষে সমস্ত অন্ধকার দেখিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সৌদামিনী আসিয়া পুঁটিকে কোলে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তুই যে আমার শচীর বউ! মা, তুই পোড়াকপালী কেন হবি, তুই যে রাজরাণী। আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে শচীন তোকে রেখে

গেছে, সে কি কখনো বেশীদিন আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে? সে শীগ্‌গীরই ফির্‌বে। তোকে আমি এমনি সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে ব'সে থাকবো, শচী এলে তখন নূতন ক'রে বাসর হবে।"

কপালে করাঘাত করিয়া সকল রমণীই সৌদামিনীর শোকে হায় হায় করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বলিলেন, "আহা, এ শোক কি ও সইতে পারবে গো, দু'দিনে পাগল হয়ে যাবে।"

ঠিক সেই সময়ে অনেকে আবার এ কথাও কাণা-কাণি করিতেছিলেন, "পরের পাপ বাড়ী ব'য়ে ঘাড়ে নিয়ে শেষে হাতে হাতে এই ফল ফ'ল্‌লো, কোথাকার এক দুশ্চরিত্তির মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে, তার পেটের কাঁটা পর্য্যন্ত পুষে, শেষে এই লাভ হ'লো, তখন কারু কথা কাণে নিলে না, কারু সুপরামর্শ শুনলে না,—মান্‌লে না। কথায় বলে,—লঘু গুরু মান না, পাছে হাঁটবে জান না।"

জলস্রোতের সঙ্গে কালস্রোতের তুলনা জগতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে, তবে দুঃখের দিন গুলি ঠিক যেন সমভূমিতে জলস্রোতের মত ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে, আর সৌভাগ্যের দিন, সুখের সময়, উৎসবের দিনগুলি যেন উচ্চস্থান হইতে নিম্নাভিমুখে খরবেগে বহিয়া যাইতেছে।

পুঁটি আজ তিন বৎসর হইল বিধবা হইয়াছে, নবযৌবন তাহার সারা দেহে আগমন সূচনা জানাইতেছে, তাহার বালিকা সুলভ চঞ্চল গতি এখন মন্থর, চক্ষের দৃষ্টি সলাজ অথচ কৌতূকপূর্ণ; তার সুকুমার শ্যাম-শ্রী সুপুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সুগঠিত মুখাবয়বে

ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া তাহাকে অনিন্দনীয়া তরুণীতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু তার এই তরুণ যৌবন, দিনের পর দিন যতই তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে লাগিল, সারদা ততই শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন, "হে মা কালী, পোড়াকপালীর কপালে যখন কালী ঢেলে দিয়েছ, তখন ওর এ রূপে আর দরকার কি? এ রূপেও ওর কালী মাখিয়ে দাও।" হায়, এই সারদাই এক সময় মেয়ের রঙ শ্যামবর্ণ বলিয়া মা-কালীর কাছে কত প্রার্থনা করিতেন, যাতে মেয়েটার একটু শ্রী ছাঁদ হয়, লোকে দেখিয়া পছন্দ করে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে অবস্থার এখন কি পরিবর্ত্তন! পুঁটি স্বভাবতঃই অত্যন্ত চঞ্চল ও হাস্য-কৌতুকপ্রিয় ছিল। কিন্তু এখন সে বয়সের অপেক্ষা অনেক বেশী গম্ভীর হইয়াছে, বিধবার ওখানে যাইতে নাই, এটা করিতে নাই, ওটা শুনিতে নাই, মাতার এ সকল নিষেধবাণী সহজেই সে মানিয়া চলে, কিন্তু সময়ে সময়ে তার মানসিক বৃত্তিগুলা মনের মধ্যে বসিয়া বুঝি বিদ্রোহ বাধাইবার প্রয়াস পায়, হায় অভাগিনী!

সতীশ বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, এ দিকে দুরন্ত হইলেও পড়া শুনায় সে খুব মনোযোগী। দুঃখী এখন প্রায় চারি বৎসরের বালক, সুন্দর, সুস্থকায়, নধর দেহ। সারদা ও পুঁটি তাহাকে অত্যন্ত যত্নে, স্নেহে মানুষ করিতেছে. পাড়া প্রতিবাসিনীর নানা কথায়, অনেক বার সারদারও মনে হইয়াছিল, বুঝি এই অনাসৃষ্টি অনাচারের জন্য বিধাতা তাঁহাকে এতো বড় গুরুতাপ দিলেন, তখনই তাঁহার মন ঐ হতভাগ্য মাতৃ-হীন শিশুর উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না, তাঁহার মনে হইল, শচী তো আর ফিরিবে না, তা ছাড়া—

তিনি ছাড়া এ সংসারে সে দুগ্ধপোষ্য শিশুর যে আর কেহই নাই, সুতরাং পরে আর কেহ যখন এসব কথা তুলিয়া তাঁহার কাছে সহৃদয়তার পরিচয় দিতে আসিত, তিনি মুখ ভার করিয়া তাড়াতাড়ি কহিতেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, সে কথায় কাজ কি এখন!"

কোনো বিষয় লইয়া বেশী কিছু চিন্তা করা বিজয়ের স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও, পুঁটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গুরুদেবকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, উপস্থিত মেয়েটার কিছু লেখা পড়া শেখার বন্দোবস্ত কর, বিদ্যা-বুদ্ধি হ'লে সংসারের পথে, যে কোনো অবস্থায় চ'লতে বিশেষ কঠিন বোধ হবে না।" বিজয় উহা মানিয়া লইয়া, পুঁটির শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন, প্রত্যহ সতীশকে পড়াইবার সময় পুঁটিকেও পড়াইতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে পুঁটি দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়াই বিদ্যা শিক্ষার ইতি করিয়াছিল, সুতরাং সতীশও এখন স্বচ্ছন্দে উৎসাহের সহিত দিদির শিক্ষকতা করিয়া গৌরব অনুভব করে। পাড়া-প্রতিবাসীরা বিন্তু বিধবা মেয়েকে এরূপ লেখা পড়া শেখান দেখিয়া, তাহার ভবিষ্যতের মঙ্গল চিন্তায় বিশেষরূপই উদ্বিগ্ন হইয়া সারদাকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, বেচারী সারদাও ভয় পাইয়া, মেয়েকে পড়ার জন্য, ছেলেকে উহার শিক্ষকতার জন্য ধমক দিলেন, এবং বিজয়কেও বার বার করিয়া পুঁটিকে লেখা পড়া শিখাইতে নিষেধ করিলেন; পাঁচজনে পাঁচ কথা কহিতেছে—ইহাও জানাইলেন। বিজয় কিন্তু সে সব কথা কাণেই তুলিলেন না, সুতরাং সারদা গুরুদেবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি আসিলে সারদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "দেখুন বাবা, উনি তো লোকের কথা কাণেও তোলেন না, গায়েও মাখেন না, অথচ তার ফল

হাতে হাতে একবার পাওয়া গেল, এই দেখুন, মেয়েটার কপাল পুড়ে গেল। ঐ সোমত্ত মেয়ে বুকের ওপোর নিয়ে আমায় তো পাঁচজনার মধ্যে বাস ক'র্‌তে হবে, তা হিঁদুর ঘরের বিধবা মেয়েকে এখন আবার ইংরিজী বাজনা শেখাবার কি দরকার? লোকে ছি—ছি ক'র্‌ছে, মেয়ে-ছেলে কিছু চাক্‌রী করতে যাবে না যে, ব্যাটা-ছেলের মতন লেখা-পড়া শেখা চাই। একটু আধটু পুঁটি শিখেও ছিল, শচী যদি বেঁচে থাক্‌তো, আরও বেশী শেখাত, সে কিছু দোষের কথা হ'ত না, কিন্তু কপাল যখন পুড়েই গেল, তখন আর লেখা-পড়ার সখ কেন? সাধ কোরে আবার এক হাঙ্গামা ডেকে আনা—আমি তো সদা-সর্ব্বদা ভয়েই কাঁপছি, আপনি বাবা পুঁটির লেখা-পড়া বন্ধ কোরে দিন্।"

গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এত ভয় পাচ্ছ কেন মা? লেখা-পড়া কিছু খারাপ জিনিষ নয়, ঐ কচি মেয়ে বিধবা হয়েছে, সমস্ত জীবন ওর প'ড়ে আছে, সে'টা কাটাবার জন্যে কিছু সম্বল তো ওকে দেওয়া চাই, নইলে কি আঁকড়ে চির জীবন কাটাবে?"

সারদা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "আমি বাবা মূর্খ মেয়ে-মানুষ, বেশী কিছু বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু ঐ তো মিত্তিরদের ঘরে দু'টো বিধবা বউ রয়েছে, মুখুজ্যেদের ক্ষান্ত ন'বছরে বিধবা হয়েছিল, সেও তো আছে, ওরা তো সব লেখা-পড়া শেখেনি, সামান্য একটু-আধটু জানে, তাতেই রামায়ণ মহাভারত পড়ে, বিশেষ মেয়ে-ছেলের, সংস্কৃত, ইংরিজী এসব শিখে কি হবে বাবা? অনেকেই ব'ল্‌ছেন, এ-সব শিখ্‌লে মেয়ের মন বিগ্‌ড়ে গিয়ে মতি গতি অন্য রকম হবে, তখন আবার কি হ'তে কি ঘটে বস্‌বে, এই আমার ভয়। তার চাইতে, ঘর কন্নার কাজ নিয়ে থাকুক, ঠাকুর-দেবতার পুজো

করুক্, মন্তর নিক্, একটু বয়স হোলে তীর্থ ধর্ম্ম ক'র্বে, তা'তেই ইহ-পরকালের মঙ্গল হবে। আপনি জ্ঞানী মানুষ, বুঝে দেখুন, এইটেই ওর পক্ষে ভাল, কি না।"

গুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দেখ মা, চিরদিনের সংস্কারের বশে তোমাদের যে ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে, সে'টাকে সরিয়ে দেওয়া বড় সহজ সাধ্য নয়। লেখা পড়া শেখা যে মেয়েদের পক্ষে খুব দোষের কথা, এ'টা বড় ভুল! দু'চার খানা বই প'ড়্লেই যে মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট বিদ্যা শিক্ষা হ'য়েছে মনে করা যায়; সে ও একটা মস্ত ভুল, অল্প বিদ্যাতেই বরং বেশী অনিষ্ট হয়। পুঁটি বেশ বুদ্ধিমতী, মন দিয়ে শিখ্ছেও বেশ, এ সময়ে তুমি যদি বাধা দাও, ওর উৎসাহ ভেঙ্গে যাবে। লোকের কথায় অতো ভয় পাও কেন মা? ভাল মনে, ভাল কাজ কোরে যাবে, পরের কাছে জবাব দিহির ভয় রাখ্বে না, মনে রেখো মা। যে ভয় করে, ভয় আরও ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ কোরে তাকে বিভীষিকা দেখায়।"

সারদা কহিলেন, "তা তো বুঝি, কিন্তু পাঁচ জনার মধ্যে বাস কোরে, পাঁচ জনার কথা উপেক্ষাই বা করি কোন্ মুখে? সংসারে বাস ক'র্তে হ'লে, লোক-নিন্দাকে মেনে না চ'ল্লে সংসারী লোকের যে দুর্গতির সীমা থাকে না।" গুরুদেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মনে একটু বল আন মা, বিধবা মেয়েকে লেখা পড়া শিখ্তে দিয়ে এমন কিছু অন্যায় তুমি করনি, যার জন্যে এতো ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছ।" এই সময়ে দুঃখীকে কোলে লইয়া পুঁটি শোভাদের বাড়ী হইতে বেড়াইয়া আসিল, দুঃখী গুরুদেবকে দেখিয়া "দাদা যাব।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি পুঁটির কোল হইতে নামিয়া গুরুদেবের কোলে গিয়া উঠিল। দুঃখীর নামের সহিত তাহার দেহের মোটেই মিল নাই,

মনেও না। ফুটন্ত গোলাপ তুল্য তার তরুণ দেহ-কান্তি, মাথা ভরা চিকণ কোঁকড়ান চুলের রাশি, নিটোল সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য-পূর্ণ পরিপুষ্ট নধর দেহ, মনটিও সেইরূপ প্রফুল্ল, কিন্তু তার দুরন্ত-পণায় সর্ব্বদাই সকলে অস্থির। গুরুদেব শিশুকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "তুমি দাদা, না আমি দাদা ?" দুঃখী উত্তর দিল "আমি দাদা, তুমি দাদা।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার কহিল, "আমি পেয়েচি· গালী চলেচি, মাছ কেয়েচি।" গুরুদেব কহিলেন, "তোর কোনো কথাটার সঙ্গে যে কোনো কথারই মিল দেখ্‌ছি না, কি কোরে তবে বুঝ্‌বো!" দুঃখী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল, "এটা তোমার নাটি, আমি নেবো, বেল্লা মাব্বো।" পুঁটি কহিল, "আজ দুঃখীর দুধ বেড়ালে খেয়ে গেছে, সেই জন্যে রাগ হয়েছে, বেল্লা মারবে ব'ল্‌ছে, নইলে বেড়ালটাকে খুব ভালবাসে—কোলে নেয়, চুমু খায়।"

২২

পূর্ণেন্দু কটকের কলেজে প্রফেসর হইয়া যাইতেছে, রজনী সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার জন্য একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিয়াছেন, বড়দিনের ছুটির মধ্যেই পূর্ণেন্দুকে যাইতে হইবে। ষোল বছরের বধূ সুরমা স্বামীর সঙ্গে যাইতে পাইবে বলিয়া বড় খুসী, বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত বেচারী একা-একাই স্বামী গৃহে কাটাইয়াছে,—বছরে দু'চার দিনের জন্য কয়েকবার যা দর্শন মিলিত মাত্র। স্বামী, সান্ত্বনা দিয়া রাখিত, পাঠ সাঙ্গ হইলেই স্ত্রীকে লইয়া যাইবে. কিন্তু পাঠ শেষ করিয়া যখন কলিকাতার কলেজে পূর্ণেন্দু নিযুক্ত হইল, তখনও কি না সুরমাকে বলিল, "এ'টা আমার অস্থায়ী

পদ, শীঘ্রই কোথাও স্থায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত হইব, তখন তোমায় কাছে রাখিব।" সুরমা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় রহিল, এখন সেই শুভদিন সত্যই আসিয়া উপস্থিত ; সুতরাং সে বড় খুসী। প্রফুল্ল এবারে বি-এ দিবে, বড় দিনের ছুটীতে কলিকাতা হইতে সেও পূর্ণেন্দুর সহিত এক সঙ্গে বাড়ী আসিয়াছে। তাহার —মা, ছেলের বিবাহের জন্য খুব বেশী রকম উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, যামিনীকে সে জন্য সর্ব্বদাই তাড়া দিতেছেন, যামিনীর কিন্তু কাঁচা বুদ্ধি নহে, তিনি জানেন, ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বরের বাজারে দর বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর একজন করিয়া, অনেকেই রজনীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, দুইজন ভৃত্য ব্যস্ত ভাবে ক্রমাগত পান, তামাক ও চা যোগাইতে লাগিল, সেই সময়ে তাঁহাদের সভা হইতে, দূরে বারেন্দার অপর প্রান্তে বসিয়া পূর্ণেন্দু ও প্রফুল্ল নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিতেছিল, "কিন্তু আমার মনে হয় পূর্ণ-দা, পুঁটির আবার বিয়ে দেওয়াই ভাল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তো হিন্দুমতে বিধবা-বিবাহ দেবার শাস্ত্রমতে ব্যবস্থা কোরে গেছেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা তার প্রতিবাদ কোর্‌তে পারেন নি, সুতরাং—" বাধা দিয়া পূর্ণেন্দু কহিল, তুমি ভাই ভুলে যাচ্ছ যে শাস্ত্র মতের চাইতে দেশাচার আর লোকাচার নিয়েই সমাজের কাজ কর্ম্ম চলে, আর চলে—মানুষের পুরুষপরম্পরাগত চিরন্তন সংস্কার নিয়ে। বিশেষ ক'রে আবার পল্লীগ্রামের লোক, সে ক্ষেত্রে পুঁটির বিয়ে হওয়া অসম্ভব। তা'র চাইতে বিজয়-কাকা তা'র পড়া শোনার যে বন্দোবস্ত করেছেন, সেই ভাল।"

প্রফুল্ল সোৎসাহে কহিল, "সে কি পূর্ণ-দা, তোমার এতো উচ্চ শিক্ষা, এতো উদার মত, তার ওপোর এতটা কাল ব্রাহ্ম পরিবারে কাটিয়ে এলে, সেই তুমি কিনা, বাল-বিধবার বিবাহের পক্ষপতী নও ?"

পূর্ণেন্দু হাসিয়া কহিল, "তুমি যে ভুল বুঝ্‌লে প্রফুল্ল ; আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য—ক্ষেত্রে বিধীয়তে কর্ম্ম।"

বাধা দিয়া প্রফুল্ল কহিল, কিন্তু পূর্ণ-দা, সামাজিক কোনো নিয়মের যদি সংস্কারের আবশ্যক হয়, তা হ'লে তোমার ও প্রবাদ-বাক্য তো খাটবে না, তখন তো কোমর বেঁধে না দাঁড়ালে চ'ল্‌বে না !"

পূর্ণেন্দু কহিল, "সে কোমোর বাঁধবার মতন শক্তি তো ভাই সবার নেই ; যার আছে, সে দাঁড়াক্‌, তোমার আমার সে চর্চ্চায় কাজ কি ?"

প্রফুল্ল একটু দমিয়া গিয়া কহিল, "পূর্ণ-দা, তুমি দেখ্‌ছি, এ প্রসঙ্গে বড় coldly জবাব দিচ্ছ, ব্রাহ্ম-সমাজে এতদিন বাস ক'রে এই তুমি reformed হয়েছ ? অথচ তা'দের সমাজে প্রায় কত বিধবার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে !"

পূর্ণেন্দু কহিল, "ব্রাহ্ম-সমাজে বিধবা-বিবাহ যখন তখন হয় সত্য, কিন্তু যদি খবর রাখ্‌তে, তা হ'লে জান্‌তে পারতে, পাত্রী গুলি প্রায় সবই হিন্দু-সমাজের মেয়ে। ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়েরা অধিক বয়সে বিবাহিতা হয়, সুতরাং তা'দের দ্বিতীয় বার বিবাহের আবশ্যক হয় না।"

প্রফুল্ল কহিল, "সে বেশ কথা, কিন্তু আমাদের সমাজে দশ বারো বছরের বালিকা, যার সাংসারিক জ্ঞান কিছুমাত্র হয়নি,

,"স্বামী কি বুঝ্‌লে না, জান্‌লে না, স্বামীর সঙ্গে দিনে রেতেও আলাপের সুযোগ পেলে না, সেই স্বামীর মৃত্যুতে তা'কে সংসারের সকল প্রকার ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসিনী বেশে আজীবন কাটাতে হবে—এ কি, কঠিন অবিচার বা অত্যাচার নয়? এ সকল অভাগিনীর কথা ভাব্‌লে কি তোমার কষ্ট হয় না, পূর্ণ-দা?"

পূর্ণেন্দু কহিল, "কষ্ট যথেষ্টই হয়, অবশ্য যদি ভাব্‌তে যাই। কিন্তু এতো কথা ভাব্‌বার আছে, যে ও কথাটা ভেবে দেখ্‌বার অবসর পাইনি, আর এটাও জানি, আমার ভাবা না ভাবাতে বেচারীদের কষ্টের কিছু এসে যাবে না।"

প্রফুল্ল কহিল, "তুমি দেখ্‌ছি, এ প্রসঙ্গটা একেবারে এড়িয়ে চ'ল্‌তে চাও। কিন্তু পূর্ণ-দা, এ সম্বন্ধে তুমি আমি সবারই ভাবা উচিৎ, সমাজের আমরা সকলেই অঙ্গ, সুতরাং সকলেই এর শুভাশুভ ভাব্‌তে অধিকারী। হিন্দু-সমাজে, হিন্দু বালিকাদের হিন্দুমতে যখন বিধবা বিবাহ চালানো যেতে পারে, তখন সেইটাই যাতে চলিত হয়, তা'রই চেষ্টা করা উচিৎ, তা না ক'রে, ব্রাহ্মদের সে সংস্কারটুকু করবার আমরা সুযোগ দিয়েছি, তাঁরাও এ সুযোগ-টুকু সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে, নিজেদের খুব বাহাদুর মনে ক'র্‌ছেন। তাঁরা তো দেখেছ কেমন অকৃতজ্ঞ লোক! হিন্দুর উপনিষদ, গীতা, প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ঘেঁটে-ঘুঁটে সত্য প্রমাণ ক'র্‌ছেন, অথচ নিজেদের হিন্দু থেকে এক বিভিন্ন, উন্নতিশীল জাতি প্রতিপন্ন ক'রবার জন্যে ভারী ব্যস্ত।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "ও সব তর্ক থাক্‌গে ভাই, আমার কাছে ওর মীমাংসা হওয়া ভারী কঠিন, আমার ও সব সামাজিক কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক মোটেই আসে না,—খাই দাই, বগল বাজাই।"

প্রফুল্ল নিজের গৌরবে স্ফীত হইয়া কহিল, "ভারী স্বার্থপর, তা বউ-দি'কেও তো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ ?"

"নিশ্চয়, তিনি অনেকদিন থেকে পোঁট্‌লা-পুঁটুলি বেঁধে, অর্থাৎ, ট্রাঙ্ক, বাক্স গুছিয়ে ব'সে আছেন, তিনি কি আর না যান্ ?"

"শুন্‌ছিলাম, যে তোমার জ্যেঠাইমাও যাবেন ?"

"এখন না, গ্রীষ্মের বন্ধে আমি আস্‌বো, তার পর যাবার সময় তাঁকে নিয়ে যাব, পুরীতে জগন্নাথ দর্শন, ভুবনেশ্বর, সেতু-বন্ধ-রামেশ্বর এ সব সেই সঙ্গে তিনি সেরে আস্‌বেন, রথ দেখা, কলা-বেচা তাঁর দুই-ই এক যাত্রায় হ'য়ে যাবে। জ্যেঠাইমা এ প্রস্তাবে ভারী খুসী। এখন যাক্ সে কথা, তোমার মা যে আমায় তোমার পাত্রী খুঁজতে ব'ল্লেন, তোমার তা'তে কি মত ?"

প্রফুল্ল একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, "পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করা আমি মোটেই যুক্তি সঙ্গত মনে করি না।"

পূর্ণেন্দু হাসিয়া কহিল, "আমিও। কিন্তু মনে করা আর কাজে করা দুই ঠিক্ এক জিনিষ নয়। আমিও প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হইনি, কার্যাক্ষেত্রে তা হ'লো কই ? বই আর বউ দুইয়ের সঙ্গে সভ্যতা রেখে চলা কি কঠিন! একজনের অমর্য্যাদায় পরীক্ষায় ফেল্ ; আর একজনের অসম্মান হ'লে কাণ ও প্রাণ দুই ঝালা-পালা।"

প্রফুল্ল ও হাসিয়া কহিল, "দাদা, বৌ-দি'কে তা হ'লে একবার জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে হচ্ছে, তিনি তোমার কাছে কত কাঁদুনি গেয়েছেন, আর তোমার বাহাদুরী আছে দাদা, যে বউ-দি'র মন যুগিয়েও এত গুলা পরীক্ষা ফাষ্ট' ডিবিশনেই পাশ করে এসেছ।"

ইতিমধ্যে বাবুদের সভায় গল্প গুজব ও হাস্যধ্বনি—তুমুল তর্কে

পরিণত হওয়ায় প্রফুল্ল কহিল, "বিজয়-কাকার গলা পাচ্ছি যে, কি নিয়ে তর্ক বাধ্‌লো বুঝি!"

পূর্ণেন্দু কহিল, "এস তবে শুনি গিয়ে, কাকাকে যে যা বলুক, বড় সদানন্দ প্রাণ, খোলা লোক, আর যা বলেন—কারও মুখ চেয়ে খাতির ক'রে বলেন না, খাঁটী কথাই বলেন।"

২৩

ধরণী গম্ভীর ভাবে কহিতেছিলেন, "আমি যদি সে সময় এখানে উপস্থিত থাক্‌তাম, কখনই তোমার এ অন্যায় কাজের প্রশ্রয় দিতাম না। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে নিয়ে শেষে এই কষ্টটা পেলে, এখন নিশ্চয়ই তোমার অনুতাপ হ'চ্ছে। এ থেকে ভবিষ্যতে সাবধান হোতে শেখো।"

বিজয় কহিলেন, "কষ্টটা যদিও খুব পাচ্ছি বটে, কিন্তু সেই অভাগিনীকে আশ্রয় দিতেই যে এই কষ্টটা পেতে হয়েছে, সে'টা আমি স্বীকার ক'র্‌তে পারি না, সুতরাং অনুতাপ হবারও কিছু কারণ থাক্‌ছে না।"

ধরণী কহিলেন, "দেখ বিজয়, সমাজের শাসন উল্লঙ্ঘন ক'র্‌লে সমাজ বিদ্রোহিতা করা হয়, এবং তা'তে কোরে অন্যায়কেও যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়।"

বিজয় কহিলেন, "কিন্তু অনেক সময় সমাজের শাসন না মেনে, বিবেকের শাসনও মান্‌তে বাধ্য হোতে হয়।"

পরেশ কহিলেন, "বিবেকের দোহাই দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা তোমার কৃত কর্ম্মের অনুসরণ ক'র্‌লে, সমাজে কি রকম বিশৃঙ্খলা

এসে উপস্থিত হবে, এবং তার ভবিষ্যৎ কিরূপ অশুভ হোতে পারে, তা একবার ধীরভাবে ভেবে দেখ্‌ছ কি? তা ছাড়া ঐ যে ছেলে· টিকে সস্নেহে পালন ক'র্‌ছ, ওর পিতার পরিচয়, গোত্র প্রভৃতি কিছুই নাই ও হতভাগা সংসারে কি কোরে মুখ দেখাবে, কেমন কোরে দাঁড়াবে, সে কথাটাও একবার ভাব্‌বার কথা। পিতৃ-মাতৃ পরিচয় দিতে যখন ওর লজ্জার ভারে মাথা নুয়ে পড়্‌বে; মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হবে; সাধারণে যখন ওকে নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখ্‌বে; তখন ওর জীবন রক্ষার জন্য ও তোমাকেও ধন্যবাদ না দিয়ে, মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও ক্ষোভে—অভিশাপ দেবে মাত্র।"

বিজয় কহিলেন, "কিন্তু চরিত্রের গুণে যদি ও মহৎ হয়, ওর মন যদি উদার, শিক্ষা যদি উচ্চ হয়, তা হোলে কি ও সদ্বংশজাত মাতাল, লম্পট, মিথ্যাচারী কপটদের চেয়ে উঁচু হোতে পার্‌বে না? জন্মের ইতিহাসের কলঙ্ক কি ওর সে সমস্ত সদ্‌গুণকে ঢেকে ফেল্‌তে পার্‌বে? কখনই নয়—পাঁকে জন্মায় বোলে কোন পদ্ম-ফুলের তো কই গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি? গুণীগণ তার যথেষ্ট সমাদর কোরে থাকেন। যাঁরা গুণজ্ঞ নয়, তাদের কথা আমি ধরি না, ওর যদি নিজের গুণ হয়, তা'হোলে সংসারে ওর আদর হবেই।"

পরেশ কহিলেন, "আচ্ছা, পরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যক নেই, তোমার নিজের কথাই হোক্, মেয়েটাকে আবার গুচ্ছের লেখা-পড়া শেখার বন্দোবস্ত করেছ, এতে কি ফল ভাল হবে মনে কর! কেবল নভেল নাটকের শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে, তার চাইতে মন্ত্র দিয়ে দাও, মাথার চুল কেটে, হাত শুধু কোরে থান পরাও, বেশ ভূষার সঙ্গে মনের বড় নিকট সম্পর্ক, ওকে তুমি ঠিক্ কুমারী মেয়ের সাজ সজ্জা পরিয়ে রেখেছ, ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ

ক'র্লে মনেও ঠিক্ সেই ভাব আস্বে, তোমার ভাল ভেবেই এসব কথা বল্‌ছি।"

বৃদ্ধ উকীল হরিরঞ্জন বাবু ধীরে ধীরে তামাক টানিতে টানিতে এই সকল তর্ক-বিতর্ক শুনিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "আহা, সে কথা আর ব'ল্‌তে, হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পৃথিবীর মধ্যে একটা আদর্শ জিনিষ। তবে কি না নিতান্ত ছেলে-মানুষ, এই বয়সে হাত শুধু কোরে, থান পরালে, বাপ মা'র দেখ্‌তে বুক ফেটে যায়।"

সনৎ কহিলেন, "তা আর কি ক'র্বে, তা বোলে কর্ত্তব্যকে তো অবহেলা করা চলে না, অদৃষ্ট যখন ওর বিরূপ, তখন উপায় কি?"

বিজয় ঔদাস্য ভরে কহিলেন, "অদৃষ্টকে দেখ্‌ছি না মানাই ভাল, কিসের জন্য তার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য কোর্‌বো?"

সনৎ বিদ্রূপচ্ছলে কহিল, "তবে আবার মেয়ের বিয়ে দাও।" বায়ু সঞ্চালনে নদীর জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, সভা তেমনি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তারাসুন্দর বাবু কাণে আঙ্গুল দিয়া কহিলেন, "ছি ছি, ও কথা মুখে আন্‌তে নেই।" হরনাথ বাবু কহিলেন, "আরে তুমিও যেমন; ঠাট্টা ক'র্‌ছে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না; হিন্দুর ছেলে হোয়ে কখনও অমন কথা মনে ক'র্‌তে পারে?"

বিজয় স্থির কণ্ঠে কহিলেন, "কেন পার্‌বে না? পুরুষ যদি পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার একটি বার বছরের বালিকাকে বিয়ে ক'র্‌তে পারে, তা হোলে একটি ছোট বালিকা যদি বিধবা হয়, তা'র বিয়ের কথা মনে আনা এমন কি অসম্ভব ব্যাপার?"

তারাসুন্দর বাবু কহিলেন, "রামঃ রামঃ ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে বিজয়? পুরুষ আর স্ত্রীলোকে যে স্বর্গ আর পাতাল প্রভেদ,

সে কথা ভুলে যাও কেন? পুরুষের পক্ষে যা বিধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাই যে পাপ, অন্যায় বলে গণ্য, হিন্দুর ছেলে হোয়ে এ সহজ কথাটা আর বোল'না?"

হরনাথ বাবু কহিলেন, "কলিতে আর ধর্ম্ম রইল না, ঘোর ম্লেচ্ছাচার, এইবার দেখ্‌ছি সবাই বেহ্ম আর খ্রীষ্টান হবে।" যামিনী হাসিয়া কহিলেন, "আপনারা অতো ভয় পাচ্ছেন কেন, 'ম্লেচ্ছাচার' কাজে পরিণত হোতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে।"

গৌরী বাবু কহিলেন, "যত সব পাগলের পাগ্‌লামী সুরু হয়েছে, বিজয় তো একে মাথা-পাগলা লোক, তার সঙ্গে আপনি সুরু ক'র্‌লেই হয়েছে আর কি? আসুন তারাসুন্দর বাবু, এক বাজী দাবা নিয়ে বসা যাক্।" এমন সময় রজনী আসিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ-দের জায়গা হয়েছে, উঠে আসুন।"

তারাসুন্দর বাবু—"আঃ বাঁচা গেল" বলিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাড়াইতে দাড়াইতে কহিলেন, "আসুন গৌরী বাবু, এখন কাজের মত কাজ করা যাক্, ওরা সব বাজে কথা বকুক। কথার শ্রী দেখ না, বলে কি না বিধবার বিয়ে!—কালে কালে হোলো কি?"

সভার মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাঁহারা রজনীর আহ্বানে উঠিয়া গেলেন, ধরণী তখন মুরব্বিয়ানা ভাবে কহিলেন, "দেখ বিজয়, আমরা তোমার শুভাকাঙ্খী, সুতরাং ভাল কথাই ব'ল্‌ছি। সংসারী মানুষ, ছেলে মেয়ের বাপ, গোঁয়ার্ত্তুমী কোরে, কি রোকের মাথায় কোনো কিছু আর কোরে বোসো না, মানুষের অবশ্য এমন বয়স আসে, যখন সকল বিষয়কেই তারা 'ড্যাম-কেয়ার' কোরে চলে, কেন-না তখন বয়েস তাজা, মথার রক্ত গরম থাকে, সে বয়সে সব মানিয়ে যায়, কিন্তু সে বয়েস আমাদের উৎরে

গেছে, এখন আমাদের মগজের রক্ত ঠাণ্ডা, সুতরাং সকল দিক্ বেশ কোরে ভেবে চিন্তেই এখন আমাদের কোনো কাজ করা উচিত।"

সনৎ ও পরম গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "আর ঐ যে ঠাট্টাচ্ছলেই হোক্ বা কথাচ্ছলেই হোক্ মেয়ের আবার বিয়ে দেবার নাম ক'র্‌লে, ও সব চিন্তা কদাচ যেন মনে ঠাঁই দিয়ো না, কেন মিছে লোক হাসাবে, মেয়েটার ও ইহকাল তো নষ্ট হ'য়েছে, পরকালের দিক্‌টাও খুইয়ে রাখ্‌বে! অদৃষ্টে যা ছিল তা হয়েছে, তার ওপোর কারসাজী ক'র্‌তে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা।"

বিজয় কহিলেন, "বিচার বুদ্ধিহীন নিষ্ঠুর ভবিতব্য,—একবার তা'র সঙ্গে লড়াই কোরে দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে, হারা-জেতার পালায় সব শেষে কে জেতে তাই দেখি। তাকে আমি খুব মান্‌তাম, এইবার কিন্তু বিদ্রোহী না হোয়ে পারছি না, দেখ্‌ব অদৃশ্যে থেকে সে তার কত ক্ষমতা প্রকাশ করে; আর প্রত্যক্ষে আমার কর্ম্মই বা আমায় কোথায় নিয়ে যায়!" পরেশ উচ্চহাসি হাসিয়া কহিলেন,— "Bravo! ছিলে ঘোর অদৃষ্টবাদী, এখন আবার পুরা দস্তর কর্ম্ম-বাদী হোয়ে দাঁড়ালে যে! কেন ভাই, এ বিদ্রোহ বাধাতে যাও! ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষ এমনি কোরে নিজের দুঃখ, নিজের অশান্তি নিজেই সৃষ্টি করে।"

বিজয় গর্জ্জিয়া কহিলেন, "কাপুরুষ গুলো—তোমরাই না একদিন আমায় কাপুরুষ, পুরুষকার হীন, অদৃষ্টের দাস এই সব বোলে উপহাস ক'র্‌তে, অথচ আজ আমি যেমন অদৃষ্টকে অস্বীকার ক'রতে চাইছি, অমনি তোমরা উল্টো পালা গাইতে সুরু ক'র্‌লে? ধর্ম্মের দোহাই, সমাজের দোহাই

মেনে যত কিছু দুঃখ, কষ্ট সব পাথরের মতন সহ্য ক'র্‌তে হবে, এই বা কোন্ কথা? সমাজের কাছে এমন কি দাসখৎ লিখে দিয়েছি, যে তার বাঁধা দড়া-দড়ি সর্ব্বাঙ্গে হাজার কঠিন হোয়ে ব'স্‌লেও, তা একটি ছেঁড়বার আর আমার অধিকার নেই? না ভাই. অতোটা প্রভুত্ব আমি সইতে পারবো না, অবশ্য আমার ইষ্ট ভেবেই তোমরা উপযাচক হ'য়ে এতো সুপরামর্শ দিতে চাইছ, এতে আমি আমার বন্ধু-ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ভাই সব, তোমরা দয়া ক'রে, আমার জন্যে একটু কম ক'রে ভেবো, চাই কি, তা'তে তোমাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত আর পরিপাকেরও দোষ হোতে পারে, আর আমাকেও অকারণে অনেক খানি ঋণের দায়ে ফেলা হয়।"

ধরণী কহিলেন, "তুমি বড় অকৃতজ্ঞ, বড় অর্ব্বাচীন, কিন্তু আবার বলি, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান।"

বিজয় যোড়হাতে কহিলেন, "যা করিস্ ভাই, শাপ-মন্নি গুলো যেন দিয়ে বসিস্ নি, আর আড়ালে, ঘাড় নেড়ে নেড়ে 'যেমন কর্ম্ম-তেমনি ফল' এই কথাটা আওড়াস্ নি।"

"আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ভগবান আমার জীবনে যেন একটা মহা বিপ্লব বাধাবার আয়োজন করেছেন, দেখা যাক্ তার শেষ কি! আমিও তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিই।"

সনৎ কহিলেন, "তুমি তো এক রকম নাস্তিক, তোমার আবার ভগবান কি?"

বিজয় কহিলেন, "নাস্তিক তো নই-ই, তবে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি, আমার ভগবানকে আজ পর্য্যন্ত আমি বুঝ্‌তে পারি নি যে তাঁর স্বরূপ কি? সেই জন্যই যা দুঃখ।"

২৪

সৌদামিনীর প্রশস্ত আঙ্গিনায়, কয়েকটি থালায় বড়ি শুকাই-তেছে, দালানে একখানি ছোট চৌকীর উপর সৌদামিনী করতলে কপোল রাখিয়া অন্য মনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন, বাড়ীর বহুদিনের পুরাতন ঝি শ্যামা, বাড়ীতে আজ বাদে কাল শ্যাম-সুন্দরের দোলযাত্রা উপলক্ষে লোকজন খাওয়ান হইবে, সে জন্য রাশীকৃত বড়ি পাড়িয়া কয়েকটি সুবৃহৎ থালায় সাজাইয়া রৌদ্রে দিয়া স্নান করিতে পুকুরে গিয়াছে। ইত্যবসরে একটি ছাগল তিনটি বৎস সঙ্গে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। রক্ষক কেহই নাই, এ সুযোগ কি ছাড়িবার? ইহারা বুঝি শ্যামার মাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বড়ি গুলির সদ্ব্যহার করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে আবার মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিল,—লাঠি লইয়া কেহ তাড়া করিয়া আসিতেছে কি না, যে হেতু অনুদার মনুষ্য জাতি যে তাহাদের এ প্রকার খাওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না, সে তথ্য উহারা ভাল রকমই অবগত আছে। অদূরেই সৌদামিনী বসিয়া আছেন, কিন্তু তিনি যে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য, ইহা তাহারা ছাগ বুদ্ধিতেও বুঝিয়া লইয়াছে। এই সময়ে বরদা বেড়াইতে আসিলেন, প্রাঙ্গণে পা দিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ও মা, এ কি? ছাগলগুলো, সব ক'টায় মিলে, সব বড়ি গুলোর ভুষ্টিনাশ ক'র্‌লে যে।"

ছাগল, গতিক ভাল নয় দেখিয়া এইবার সবৎসা, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। বরদার কণ্ঠস্বরে সৌদামিনীর চমক হইল, তিনি কহিলেন, "এস দিদি, খাওয়া দাওয়া হোলো?"

"এই হোলো, তুমি দুটো সিদ্ধ কোরে কিছু মুখে দিলে?"

"দিলাম বৈ কি, পেট চণ্ডাল—নইলে মানবে কেন? বুকের ভেতর বড় হাঁফ ধরছে বোন্, বিদেশে বরং ভাল ছিলাম্, এ রাম-হীন অযোধ্যা যে বড় অসহ্য বোধ হ'চ্ছে।"

বরদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, সহানুভূতি জানাইয়া, সৌদামিনীর পাশে গিয়া বসিলেন, এই সময়ে স্নানান্তে শ্যামা ঝি ফিরিয়া আসিল, দুয়ারে ঢুকিবার সময় পলায়নপর ছাগলটির সহিত তার শুভ সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সুতরাং বড়ি গুলির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই সে গলার স্বর পঞ্চমে তুলিয়া, ছাগলের ও তার উর্দ্ধতন সাত পুরুষের উদ্দেশে অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। সৌদামিনী ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ্ কর্ শ্যামা, দুপুরে-মাতন আর ভাল লাগে না, চেঁচালে কি তোর বড়ি গুলো আর ফিরে পাবি? আগ্‌লে কেন বোসে থাকিস্ নি?"

শ্যামা ইহার উত্তর না দিয়া বরদাকে কহিল, "হ্যাঁ বউ-দিদি, তুমিও তো ছিলে, একটু দেখলে না গা! এত মেহনৎ কোরে ঠাকুর দেবতার নামে জিনিষ ক'র্‌লুম, তা সব খেয়ে গেল, সর্ব্বনাশীর হজম হবে না, ছেরিয়ে মর্‌বে।"

বরদা কহিলেন, "আমিই তো এসে তাড়ালুম, নইলে তোর সব যেতো, তা গালাগালি দিয়ে তুই কি ক'র্‌বি, ওদের কি বুদ্ধি আছে যে পরের জিনিষ খেতে নেই! যাদের ছাগল তারা আটক রাখে না কেন?"

শ্যামার তখন হুঁস হইল, ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুকাইতে দিতে দিতে কহিল, "এই রোসো না, পরাণ মোড়লের ছাগল বটে, এখুনি যাচ্ছি, বাছাধনের ধুড়-ধুড়ুনি নেড়ে দিয়ে আস্‌ছি।"

শ্যামা প্রস্থান করিল, বরদা তখন কহিলেন, "হ্যাঁ বউ, তিন্-

তিন্‌টে বছর খুব তীর্থে তীর্থে ঘুরে এলে। কোথায় কি দেখ্‌লে, তাই সব বল।"

সৌদামিনী কহিলেন, "অনেক দেশ ঘুর্‌লুম দিদি, তীর্থ ভ্রমণে যাবার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অবসর আর 'হোয়ে ওঠে নি, কিন্তু ভগবান আমার শচীকে কেড়ে নিয়ে, এমন আগুন বুকের মধ্যে জ্বেলে দিলেন; যার জ্বালায় অস্থির হোয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম, তিন-তিন বছর দেশ হোতে দেশান্তরে, তীর্থ হোতে তীর্থে ঘুরে বেড়ালুম, বুকের ভেতর সে কি অসহ্য জ্বালা, সে তো কথায় বলা যায় না দিদি, শচী হারা হোয়ে সে যে কি যাতনা পেয়েছি, আর পাচ্ছি, তা আমারি মতন হতভাগী ছাড়া আর কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

সৌদামিনীর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, বুকের ভিতর—জমাট বরফের মত অশ্রুসাগর উত্তাপ লাগিয়া গলিতে লাগিল, চক্ষু বাহিয়া ধারা নামিল, নীরবে সৌদামিনী রোদন করিতে লাগিলেন, বরদা ও সে ক্রন্দনে যোগ দিলেন। শচী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল, গ্রাম শুদ্ধ সকলেই শচীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, শচীর মৃত্যু শেল—পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ সকল নর-নারীরই বুকে বড় বাজিয়াছে। এমন কি, সকলেই বলেন,—এ হেন পুত্র রত্নের শোকে সৌদামিনী যে আজও প্রকৃতিস্থ হইয়া বাঁচিয়া আছেন, ইহাই আশ্চর্য্য।

কিছুক্ষণ পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "কত কেঁদেছি দিদি, কাঁদার কি আর শেষ নেই? বুকের ভেতর দাউ দাউ কোরে যেন রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে, অথচ চোখে একি অফুরন্ত অশ্রু ধারা! তীর্থে তীর্থে কত ঘুর্‌লুম, দেব-মন্দিরে

প'ড়ে কাতর কণ্ঠে কত প্রার্থনা করলুম "হে ঠাকুর! আমার কোন্ অপরাধে এ দাগা দিলে? বুঝিয়ে দাও ঠাকুর, কি পাপে আমি আমার কোলের এক মাত্র সন্তান হারালুম! একবার শুধু আমায় জানিয়ে দাও দেবতা, যে পূর্ব্বজন্মেরই হোক্ বা এজন্মেরই হোক্, কোন্ মহা পাপের এই গুরুতর শাস্তি—তা হোলেই আমি মুখ বুজে সব সহ্য ক'র্‌বো, তোমার দুয়োরে আর অভিযোগ ক'র্‌বো না। কিন্তু কই, কোথাও কিছু সাড়া শব্দ পেলুম?—পাথরের দেবতা পাথর হয়েই রইলেন, অভাগীর প্রাণে কোনো শান্তিই এলো না। পাণ্ডার দল, কত জনে কত কথাই বল্‌তে লাগ্‌ল, কেউ বলে, 'মা, তোর পূর্ব্বজন্মে এই পাপ ছিল, এখন এই স্বস্ত্যয়ন কর্, সব ক্ষমা হোয়ে যাবে।' কেউ বলে, 'মা, এই তীর্থে এই সুফল কোরে নে, পর-জন্মে আবার ছেলে কোলে পাবি।' হায়—হায়, এ-জন্মে তেমন কোল জোড়া রত্ন হারিয়ে আবার পরজন্মের আশা! কিন্তু তা'দের নিরাশ ক'র্‌লুম না, যে যা চাইলে, তাই দিয়ে তা'কে সন্তুষ্ট কোরে, এক স্থান হোতে অন্য স্থানে যেতে লাগ্‌লুম, জয় জয়কার রবে তা'দের কণ্ঠ বেজে উঠ্‌লো, মুক্ত কণ্ঠে তারা আমায় কত আশীর্ব্বাদই ক'র্‌লে, কিন্তু আমার মনের কালী তো কিছু ঘুচ্‌লো না! বুকের জ্বলিত আগুনে এক ফোঁটাও ঠাণ্ডা জলের ছিটে প'ড়্‌লো না। সেই বুক-ভরা হাহাকার নিয়ে, পুষ্কর, সাবিত্রী এসব তীর্থ ঘুরে হরিদ্বারে গিয়ে প'ড়্‌লুম, সেখানে অনেক দিন রইলুম, চারিদিক কার যে কি পবিত্র শান্ত ভাব, শচীকে যখন মনে থাক্‌তো-না, তখন সেখানকার মাধুর্য্য, প্রাণকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে ভ'রে দিত, কিন্তু যেমনি বাছার মুখ মনে পড়ে যেত, অমনি পৃথিবীর সব কিছুতে যেন কালীর ছোপ্ লেগে সমস্ত কালীমাখা হোয়ে উঠ্‌ত।"

সৌদামিনী চুপ করিলেন, তাঁহার ব্যথা-ভরা কণ্ঠস্বর, হা হা করিয়া বাতাসে কাঁপিতে লাগিল। বরদা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কি বলিয়া দিবেন? পতিহীনা, একমাত্র পুত্রহীনাকে সান্ত্বনা দিবার মত কথা কি আছে? কিছুক্ষণ পরে সৌদামিনী আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রত্যহ ভোরে স্নান কোরে, গঙ্গার নির্জ্জন তীরে গিয়ে পূজা-আহ্নিকে ব'সতুম, কাতর-কণ্ঠে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ডাকতুম "হে নারায়ণ! হতভাগিনীকে সকল রকমে যখন কাঙ্গাল ক'রলে, তখন এর সমস্ত মন প্রাণ তোমার পায়ের দিকেই টেনে নাও, তোমাতে যে পাপ-মন স্থির রাখতে পারছি না, পরকালের পথও খোয়াতে ব'সেছি। দয়াল ঠাকুর, এখন সব পাপ ক্ষমা কোরে হতভাগিনীকে তোমার চরণে ঠাঁই দাও, এ পৃথিবীর শোক তাপ আর সহ্য ক'রতে পারছি না প্রভু, এখন আমার জীবন শেষ কোরে দাও, পৃথিবীর বাসা আমার ভেঙ্গে যাক্—দয়া কোরে এই এখন বর হরি! শচী-শূন্য ঘরে আর যেন এ পোড়া মুখ নিয়ে না ফিরে যেতে হয়, এ দেহ যেন এ'খানেই মা গঙ্গার কোলে রেখে যেতে পারি। একদিন কিন্তু এই রকম প্রার্থনার পর হঠাৎ শুনতে পেলুম,—'তোর এখনও পৃথিবীতে কিছু করবার আছে, অনেক টাকা তোকে দিয়েছি, কিছু সৎকাজ কোরে নে'—ঠিক যেন বাণী দৈব-বাণীর মতন শুনলুম, তখন সেই কথা মাথায় কোরে নিয়ে আবার দেশে ফিরলুম, সত্যিই তো আমার অনেক সম্পত্তি আছে, আমি মোরে গেলে পাঁচ ভূতে লুটে খাবে বই তো নয়; তা'র চেয়ে এখন থেকে সৎকাজে কিছু লাগিয়ে যেতে পারলে পাঁচ জনের উপকারে আসবে।"

বরদা ভক্তিভরে দেবোদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "সে তো

বেশ কথা বোন্, সৎকাজে ব্যয় কর্‌বার শক্তি কি সবার হয়, সে ও অনেক ভাগ্যের কথা। সংসারে, পতি-পুত্র নিয়ে আমরা পরকালের ভাবনা ভুলে থাকি, নইলে এ সব তো ভোজবাজী, আজ আছে, কাল নেই। চোখ্ বুজলেই কে কার! তীর্থে তীর্থে সৎকাজ কর, কাশীতে অন্ন-সত্র দাও, শত শত গরীব দুঃখী প্রতিপালন হোক্, তোমার পুণ্য হবে। গঙ্গায় নাইবার ঘাট বাঁধিয়ে দাও, গঙ্গাস্নান কোরে লোক তোমায় আশীর্ব্বাদ কোরবে, এই সব ভাল কাজ কোরে যেতে পার্‌লে ইহ-পরকালে মঙ্গল হবে; বৃন্দাবনে পার্‌তো একটি মন্দির স্থাপনা কোরে দাও, তাতেও কত ফল হবে।"

সৌদামিনী চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "বিদেশে কিছু কোরে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ ক'র্‌ছি না দিদি, দেশেই কিছু কর্‌বার ইচ্ছে হয়েছে,—"

বরদা কহিলেন, "বেশ তো বউ, স্বচ্ছন্দে একটি শিব স্থাপনা কর, সেখানে অতিথি-বোষ্টমের সেবারও ব্যবস্থা রাখ্‌বে, এতে তোমার পরকালের খুব কাজ হবে। শচী তোমার আর জন্মে শত্রু ছিল বোন্, নইলে তোমায় অমন কোরে কাঁদিয়ে গেল কেন? তা'র জন্যে কেঁদে কেঁদে আর চোখ-গতর মাটি না কোরে, ঠাকুর দেবতার পূজা আশ্রা নিয়ে থাক, দান ধ্যান কর, সেই ভাল হবে।"

সৌদামিনী উত্তর দিলেন না, অন্য মনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

২৫

বৈশাখের মাঝামাঝি। প্রখর সূর্য্য-কিরণে বাতাস তাতিয়া আগুণের মত হইয়াছে, স্বয়ং সূর্য্যদেব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া নদী ও পুষ্করিণীর

জল যেন হু হু করিয়া শুষিয়া লইতেছেন, গাছ-পালা শ্রীহীন, মাঠ তৃণ-শূন্য, চারিদিক যেন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে ; দ্বি-প্রহরের অসহ্য গ্রীষ্মে সকলেরই প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে, এক আছ্‌ড়া জল পড়িলে সকলেই যেন বাঁচে—কৃষকেরাও জমীতে লাঙ্গল দিতে পারে। আশা ভরা নেত্রে তা'রা বার বার আকাশ পানে চাহিতেছে, কিন্তু কোথায় নবজলধরের শ্যাম কান্তি? অসীম সুনীলাকাশ—জ্বালাময় সূর্য্য-কিরণে যেন তীব্র-জ্যোতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, দু-দণ্ড চাহিয়া দেখিতে সাধ্য কি? এই ভয়ানক সময়ে গ্রামে কলেরা রোগ দেখা দিল, দু-একজনের মৃত্যু হইল, গ্রামবাসীরা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। যাদের ছিপে মাছ ধরা বাতিক আছে, তারা কিন্তু সকল আপদ বালাই তুচ্ছ করিয়া নিয়মিত সময়ে, চারের পাত হাতে লইয়া পুকুর পাড়ে গিয়া ছিপ্ ফেলিতে ছাড়ে নাই; আর ছাড়ে নাই,—দুরন্ত ছেলেগুলা, অভিভাবকদের নিষেধ ও শাসন স্বত্বেও দুপুর রোদ্রে হেথা সেথা ঘুরিয়া কাঁচা আম বা পেয়ারা খাওয়া।

সতীশ কিন্তু মাতার তিরস্কার ও পিতার শাসনে—তা ছাড়া দিদির চোখে চোখে থাকিয়া, গ্রীষ্মের ছুটি হইলেও, দুপুর বেলা কাঁচা আম খাইতে বাড়ীর বাহির হইত না, মা বলিতেন,—হাট হইতে অনেক আম কিনিয়া আনিবেন, এবং আনাইতেনও। কিন্তু সঙ্গীদের সঙ্গে গাছে চড়িয়া আম পাড়িয়া খাওয়ার সঙ্গে, বাজারের কেনা আম বাড়ীতে বসিয়া খাওয়ার তুলনা যে কত অকিঞ্চিৎকর, তা তো মায়ের দল বুঝিয়া উঠিতে পারেন না! প্রত্যহ দুপুর বেলা সমবয়স্ক সমপাঠীদের আহ্বান ফিরাইয়া দিবার সময় সতীশ যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিত, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? কিন্তু বিধাতার বিধান মানুষের বোধাতীত, এত সাবধানে

থাকিয়াও কাল-ব্যাধি সতীশের তরুণ সুকুমার তনু অধিকার করিয়া বসিল, রাত্রে হঠাৎ পীড়া আরম্ভ হইল, এবং যথেষ্ট চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা স্বত্বেও বালকের চ'ক্ষে ও মুখে মৃত্যুর কালছায়া ঘনাইয়া আসিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রফুল্ল, পুর্ণেন্দু উহারা সকলেই দেশে আসিয়াছিল, সুতরাং সতীশের সেবা উহারাই সাধ্যমত করিতেছিল, সে সময়ে গুরুদেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি শতীশকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া পড়িলেন। আর বিজয়—তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, সতীশের যে মৃত্যু সন্নিকট, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, হঠাৎ খারাপ অসুখ হইয়াছে, সেবা-শুশ্রূষা বিশেষ রকম প্রয়োজন, ইহা জানিয়া ছুটা-ছুটি করিয়া যখন যা প্রয়োজন—ঔষধ, বরফ ইত্যাদি যোগাইতেছিলেন; পাড়া-প্রতিবাসী, বন্ধুবর্গ যাঁহারা সতীশকে দেখিতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের ও অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার ধন নাই, সম্পত্তি নাই, সে সবের কামনাও নাই, আছে শুধু মুক্ত, সদানন্দ সরল প্রাণ। একমাত্র কন্যাকে বিবাহ রাত্রে বিধবা করিয়া সে প্রাণেও ভগবান দাগা দিয়াছেন, এখন একমাত্র সম্বল এই পুত্র ধন। দারুণ পিপাসায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সতীশ যখন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; অসহ্য গাত্র-দাহ যখন অচেতন দেহকে ও বিছানায় স্থির থাকিতে দিল না, তখন বিজয় যেন পাগলের মত হইয়া গেলেন, বারবার পুর্ণেন্দু ও প্রফুল্ল সতীশের ওষ্ঠে জলসেক করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি বালকের ওষ্ঠাধর পিপাসায় শুকাইয়া গিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তৃষ্ণায় সে কি অসহ্য জ্বালা! সে নির্ম্মম দৃশ্য দর্শনে, নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। তারপর ঠিক সন্ধ্যার সময় যখন সূর্য্যদেব সমস্ত আকাশে

কুঙ্কুম আভা ছড়াইয়া দিয়া পাটে বসিলেন, সেই সময় সব শেষ হইয়া গেল।

সারদা একবার—"সতীশ, বাপ্ আমার, কোথায় চ'ল্লিরে!"—বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াই মৃত পুত্রের পায়ের তলায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; বিজয় অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অভাগিনি! অম্নি স্থির হোয়েই পড়ে থাক্, ও মূর্চ্ছা তোর আর যেন না ভাঙ্গে, তোকে সান্ত্বনা দেবার পুঁজি আজ আমার নিঃশেষে উজাড় হোয়ে গেল, সতীশ শূন্য ঘর বাড়ী দেখার চাইতে মৃত্যুই ভাল।"

গুরুদেব বিজয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন, বিজয়কে ধরিয়া বসাইতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "স্থির হও বিজয়, তুমি পুরুষ, তোমার এত অধৈর্য্য হোলে চ'ল্‌বে কেন? তোমায় বুক পেতে সব স'ইতে হবে। ঐ দেখ, পুঁটি যে মাটিতে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে; বৌ-মা অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন; তাঁদের এখন তুমিই সান্ত্বনা দাও!"

"পূর্ণেন্দু, তুমি পুঁটিকে একটু দেখো প্রফুল্ল, তোমার কাকীমার মুখে জল দাও।"

বিজয় কোনো কিছু কথা কাণে না তুলিয়া কহিলেন, "গেল সে? সত্যিই চলে গেল? সতীশ নেই? এ বাড়ীতে আর তা'কে দেখ্‌তে পাব না? আর সে আমায় বাবা বোলে ডাকবে না? ওঃ অসহ্য—অসহ্য। ভগবান্! এই তোমার সৃষ্টি; এই তোমার ন্যায়-বিচার! কি করেছিলাম আমি, যে জীবন-যাত্রার প্রতি পদে আমায় এমন কোরে ঘা দিচ্ছ? কি দেখ্‌ছ পরেশ? কি দেখ্‌ছ সনৎ? আমার অদৃষ্টে ছিল,—তাই ব'ল্‌ছ? কি সে অদৃষ্ট? কার

হুকুমের চাকর সে, তাই আমায় বুঝিয়ে দাও।"—বলিয়াই বিজয় ছুটিয়া গিয়া সনতের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমি ছাড়্‌ব' না ভাই! অদৃষ্ট রহস্য আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। তোমরা যদি বুঝেছ তো আমায় আজ সব পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে দাও, যে অদৃষ্ট কি?" গুরুদেব আবার গিয়া বিজয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "কি কর বিজয়! ভেবে দেখ, এক দিন তোমার মতন এ আঘাত আমিও সহ্য ক'রেছি।"

ঐ ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘরে ঘরেই হোয়ে চলেছে, সুতরাং সেই ভেবে প্রকৃতিস্থ হও। জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, তা'কে কেউ এড়িয়ে চ'ল্‌তে পারে না।"

বিজয় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, বোলে দিন, কিসে শান্তি পাব, আমি তো অবিশ্বাসী, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস ক'র্‌লেও তাঁহার করুণায় আমার আস্থা নেই, কিন্তু আপনারা তো তা করেন; তবে এই কি তাঁর করুণার পরিচয়? এ বিশ্ব রাজ্য তাঁর সৃষ্টি; সন্তান-স্নেহ তিনিই বাপ মার মনে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এ কি ভীষণ ব্যথা, এ পুত্র-বিয়োগ-বেদনার গুরুত্ব তো তাঁর অবিদিত নয়; দয়াময় হোয়ে মানুষকে এ শোক তিনি কেন দিয়েছেন? ব'লে দিন গুরুদেব এ 'কেন'র মীমাংসা কি?"

রজনী বলপূর্ব্বক বিজয়কে টানিয়া নিজের কাছে বসাইলেন, তার পর কহিলেন, "কি পাগ্‌লামী ক'র্‌ছ বিজয়, এই কি তোমার তর্ক-মীমাংসার সময়!" উন্মত্তের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া বিজয় বলিয়া উঠিলেন, "রাস্কেল, তুমি ছেলের বাপ নও, তুমি আজ আমার অবস্থা বুঝ্‌বে কি? আমার কিছু সংস্থান নেই, কি কোনো সম্বল নেই, কিন্তু আমার বুক-ভরা ধন সতীশ ছিল। আমার একমাত্র

আশা, ভবিষ্যতের আলো—তাই আজ নিভে গেল। তবু আমি পাগল হইনি, উঃ কি ভয়ানক! এই পুত্র-শোক যে সৃষ্টি ক'রেছে, তা'কেই তোমরা দয়াময় বোলে পূজো কর? কোথায় সে নিষ্ঠুর? একবার তা'কে হাতের কাছে পেলে, তা'কেই আমি চুর্ চুর্ কোরে দিতুম। এই ব্যথা, এই আগুণ একবার তার বুকে জালিয়ে দিতে পার্‌লে, তবে আমার সাধ মিট্‌তো। তোমরা আমায় পাগল মনে কোরে উপহাস ক'রছ, তা কর, কিন্তু,—কিন্তু ঐ যা কি ব'লছিলাম; সব ভুল হোয়ে গেল। সতীশ! সতীশ! কোথা রে তুই!" বিজয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, রজনী কহিলেন, "বিজয়, তোমার চোখের সাম্‌নে এই ভীষণ দৃশ্য, তবু তোমার চোখে জল নেই; তোমার শোকে আজ সবাই আত্মহারা, সবাই আকুল হোয়ে কাঁদ্‌ছে, কিন্তু তুমি কাঁদ্‌ছ না? একবার প্রাণ ভ'রে কাঁদ ভাই!"

বিজয় প্রমত্তের ন্যায় কহিলেন, "কাঁদ্‌ব কি ভাই, আমার বুকের মাঝ্‌খানে দাউ দাউ কোরে আগুণ লেগেছে, তার উত্তাপে সব অশ্রু বাষ্প হোয়ে উড়ে গেছে, ও ভগবান্! ও নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা! কোথায় তোমরা আজ? আমার বুকের আগুণের কত উত্তাপ, তোমাদের যদি একবার অনুভব করাতে পার্‌তুম!—"

অদূরেই নিতাই বসিয়া অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, বিজয় রজনীর হাত ছাড়াইয়া, ছুটিয়া সেখানে গিয়া নিতাইয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "নিতাই, তোকে সবাই মাতাল ব'লুক, আমি তোর কথা আজ খুব মেনে নিচ্ছি, ভগবান্ সত্যই যোগ-নিদ্রায় অভিভূত নয়, তিনি বিশ্ব সৃষ্টি কোরে অবসর নিয়েছেন, নইলে তাঁর রাজ্যে এত বিশৃঙ্খলা কেন? অকালে আমার সতীশ, আমার চোখের মণি, আমার সবেমাত্র ধন, এমন কোরে চ'লে গেল কেন? সতীশ,

গোপাল, আয় বাবা ফিরে আয়!"—এইবার বিজয়ের স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল, চ'খে অশ্রু দেখা দিল, রজনী কহিলেন, "কাঁদ ভাই বিজয়, চোখের জলে পৃথিবী ভিজিয়ে ফেল, বুকের আগুন তা'তেই নিভে যাবে।" তখন বিজয় রজনীর ন্যায় আত্মহারা হইয়া "সতীশ! সতীশ!" করিয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কে বলে, পুরুষের ক্রন্দন দুর্ব্বলতার পরিচয়?—নারীরই উহাতে একচেটে অধিকার? নারীর ন্যায় তাঁ'দেরও কি স্নেহ মমতার গভীরতা নাই; শোকের গুরুত্ব উভয় হৃদয়কেই কি সমান ভাবে বেদনাহত করে না? তবে কেন অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, হৃদয় ভার লাঘব করিতে পুরুষ লজ্জিত হইবে!

২৬

সারদার ভাগ্য ভাল, বিজয়ের কথাই সত্য হইল, সতীশ শূন্য গৃহে সারদাকে আর বাস করিতে হইল না, পুত্রের মৃত্যুর তিন দিন পরে, বিসূচিকা রোগে সারদাও মরিয়া বাঁচিল, পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগের হাত এড়াইল।

পুঁটি কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িল, তাহার আকুল ক্রন্দনে বালক দুঃখী ও কাঁদিয়া আকুল হয়, বিজয় যেন কেমনতর হইয়া গেলেন, সুতরাং কে কাহাকে প্রবোধ দেয়! পূর্ণেন্দু সস্নেহে পুঁটিকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইতে লাগিল, "তুমি কেঁদো না দিদি, লক্ষ্মীটি, এখন বড় হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে, তুমি এমন ধারা কেঁদে আকুল হ'লে দুঃখীকেই বা দেখে কে, তোমার বাবাকেইবা সান্ত্বনা দেয় কে! ঈশ্বরের কাজের উপর মানুষের হাত নেই বোন,

কাজেই আমাদের সব সহ্য ক'রতে হবে, সাহসে বুক বাঁধ, তোমার বাবার মুখ চেয়ে নিজেকে শান্ত কর।"

পুঁটি সে কথা মাথায় করিয়া লইয়া প্রাণপণে ধৈর্য্য ধরিয়া পিতাকে প্রকৃতিস্থ করিবার, দুঃখীকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবোধ শিশু মা'কে খোঁজে, বার বার দাদার কথা জিজ্ঞাসা করে; পুঁটি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলে, "মা, দাদাকে নিয়ে ঐ খানে বেড়াতে গেছে, আবার আসবে।"

আর বিজয়—তিনি হঠাৎ পুঁটিকে শান্ত হইতে দেখিয়া কহিলেন, "এই বেশ হয়েছে পুঁটি, কাঁদিস্ না, খবরদার চোখের জল ফেলে মড়া কান্না কাঁদিস্ না, আমার কাণে ও শব্দ যেন ছুঁচের মতন বেঁধে বেশ হয়েছে তোর মা ও মরেছে, নইলে দিন রাত্তির কাণের কাছে প্যান-প্যান কোরে কেঁদে জ্বালিয়ে মারতো, কান্না টান্না আমি মোটে পছন্দ করি না, সতীশ ম'রবে কেন; ধ'রে নে, মামার বাড়ী বেড়াতে গেছে, তোর মা ও সঙ্গে গেছে—ব্যস। এখন দিনকতক মায়ে-পোয়ে সেইখানে থাকুক।—আয় বাবা দুঃখীরাম, তুই আমার কোলে আয়।"

বিজয়ের রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ইদানিং দুঃখী আর তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না, সুতরাং ভয়ে ভয়ে বিজয়ের কোলে গেল, বিজয় তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন, "দুঃখী, একবার বাবা বলে ডাক্, "বাবা" "বাবা" আমার সতীশ যেমন ক'রে ডাকৃত —সেই রকম ক'রে ডাক্, আজ ক'দিন থেকে যে আর সে ডাক্ শুনিনি!" তার পর বিজয়ের চক্ষু বহিয়া জল ঝরিত, উপস্থিত সকলেই সে করুণ দৃশ্যে যথেষ্ট ব্যথিত হইতেন।

বিজয়ের মনে হইত, আগা গোড়া সবটাই বুঝি এক দুঃস্বপ্ন, স্বপ্নেই বুঝি এমনতর একটা বিভ্রাট ঘটিয়া গেল, নহিলে সতীশ নাই, সারদা নাই, এ কি কখনও সম্ভব? গুরুদেবকে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেন, "বলুন গুরুদেব, বুঝিয়ে দিন্ আমায়, এই যে সমস্ত ব্যাপার ঘ'টে যাচ্ছে, এ গুলো কি সব স্বপ্ন? বা চিত্ত বিকার মাত্র? স্বপ্নই বটে, রাত্রে ঘুমিয়ে, স্বপ্নে যদি নানা বিচিত্র ঘটনা দেখ্‌তে পারি, আর সে সময় সেই স্বপ্নকে যথার্থ ব্যাস্তবিক ব্যাপার ব'লেই মনে করি; তা হ'লে, মৃত্যুর পর আমাদের আবার যে জীবন আসবে; সেই জীবনে দাঁড়িয়ে এখন কার এ সব ঘটনা স্বপ্ন ব'লেই মনে হবে বৈ কি!"

উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া আবার বলিতেন, "কিন্তু স্বপনের ও তো ভাল মন্দ আছে, আমার জীবনটা কি শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেই কাট্‌ল'? আমার সতীশ আমার বুক জুড়ে ব'সে ছিল, আমার ভাঙা কুঁড়েতে সে অমূল্য মণি হ'য়ে ছিল, আমার দিনান্তের অন্ন সংস্থান না থাক্‌লেও কোনো দিন কোনো অভাবের অভিযোগ কারও কাছে করিনি—নিজের মনের কাছেও না। সতীশ ছিল, সারদা ছিল, সেই আমার যথেষ্ঠ; তাও কি না ঘুচে গেল? সারদা, সারদা, কোথায় গেলে তুমি? তুমিও যদি থাকৃতে; দু-জনে গলা-গলি কোরে কাঁদ্‌তুম, 'সতীশ' 'সতীশ' বোলে আকাশ ফাটিয়ে দিতুম, বাতাস শিউরে উঠ্‌তো, আকাশ ভেদ কোরে সে কান্না দেবতার কাণে পৌছুতো—না না, বুঝি পৌছুতো না, দেবতা নিষ্ঠুর, বধির, দেবতা ক্রুর, হিংসুক, তারা কারু সুখ দেখ্‌তে পারে না, কারু কান্না তারা শুন্‌তে পায় না, অন্ততঃ—শুন্‌তে পেলেও সাড়া তো দেয় না।"

বিজয়ের অবস্থা দেখিয়া রজনী একদিন গুরুদেবকে বলিলেন, "আপনি জ্ঞানী, বিজয় বড় বেশী শোক পেয়েছে, তার অবস্থা দেখে আমাদের ভয় হয়, আপনি তাকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করুন।"

গুরুদেব কহিলেন, "রজনী, প্রবল শোকের প্রথম অনুভূতি যখন মানুষের সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে গভীর ভাবে অভিভূত ক'রে ফেলে, তখন সান্ত্বনা পেতে চাওয়া, বা দিতে যাওয়া নিতান্তই বৃথা, কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এ ব্যথার তীব্রতা ক'মে আসবে, তখন আপনা হ'তেই চিত্ত শান্ত হবে। দেখ বৎস, জগতে শোক পাবারও দরকার আছে। এই শোকের আগুণে সাধারণ লোকের কিছু হোক্ না হোক্, যে সব মানুষের ভিতর কিছু খাঁটী জিনিষ আছে, তারা এতে পুড়ে গিয়ে একেবারে খাঁটী হ'য়ে দাঁড়ায়। বিজয়ের এখন আর সংসারে বিশেষ কিছু বন্ধন নেই, তোমরা যদি পুঁটি আর দুঃখীর ভার নাও, তা হ'লে ওকে নিয়ে আমি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে প'ড়ি, তা'তে ও খুব শীগগির সান্ত্বনা আর শান্তি পাবে।"

বন্ধুগণ সকলেই এ প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন, পূর্ণেন্দু কটকে যাইতেছিল, সে পুঁটি ও দুঃখীকে সঙ্গে লইতে চাহিল; বিজয় ও তাহাতে খুসী হইলেন, যেহেতু তাঁহারও মনে হইতেছিল, দেশ ছাড়িয়া ছুটিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়েন, কিন্তু পুঁটি ও দুঃখীর কথা ভাবিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। বিজয়কে বিদায় দিবার সময় বন্ধুগণ সকলেই কাতর হইলেন, কারণ তাহার সহিত মুখে ও কাজে যতই অমিল হউক না কেন, ভিতরের একটা বড় যোগ সবারি ছিল। বিজয় এমন প্রকৃতির

লোক, যাহার সহিত সকল বয়সের লোকেরা স্বচ্ছন্দে মিশিতে পারিত, সকল বিষয়ে সকল কথায় তাহার সহিত বাদানুবাদ চলিত, তাহার সহিত কথা কহিতে .কপট-ভদ্রতার মোটেই আবশ্যক হইত না, অথচ এতো অমিল, এত বাগ-বিতণ্ডা চলিলেও, সকল কাজেই তাহার সঙ্গ না হইলে যেন একটা বড় রকমের অভাবও থাকিয়া যাইত।

বিজয়কে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন—আর কি তিনি ফিরিবেন? তাঁহাকে স্বদেশে টানিবার কোনো আকর্ষণীই যে আজ আর নাই, অতি শৈশব হইতে পাঠ্যাবস্থায়, যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্রে এই প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি যে সবারই অস্থি-মজ্জায় জড়িত হইয়া আছেন। আজ সকলে যেমন করিয়া জানিলেন—এই নিঃসম্বল, খোলা প্রাণ, আত্ম-ভোলা, বিচার বুদ্ধিহীন বন্ধুটি তাঁহাদের কতখানি জুড়িয়াছিলেন,—ইহার পূর্ব্বে একদিনও তেমন করিয়া কেহ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলেরই মনে হইতে লাগিল, আজ যেন কতখানি শূন্য হইয়া গেল। রজনী, যামিনী বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায়ের অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বন্ধুকে ও গুরুদেবকে যথা সময়ে পত্র লিখিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন, একজন আরও বিজয়ের সঙ্গ লইল—সে নিতাই। ছোট ছেলে দু'টী বাবুদের বাড়ী রাখালী করে, সুতরাং সে নিশ্চিন্ত মনে দাদাবাবুর সঙ্গ লইল। বিজয় যখন নিজে দারিদ্রের উল্লেখ করিয়া, সে কি খাইবে জিজ্ঞাসা করিলেন; নিতাই উত্তর দিল, "সে দেখিয়া লইবে, তবে উপাস পাড়িয়া যে থাকিবে না, ইহা ঠিক।"

২৭

বিজয় বলিতেছিলেন, “কিন্তু ভেবে দেখুন, নিরীহ, উপায় বিহীনের প্রতি সবল-সক্ষমের অত্যাচার ছাড়া এ’টা আর কি? আপনি আমায় পাষণ্ড ব’ল্‌বেন বলুন, অকৃতজ্ঞ ব’ল্‌বেন বলুন, কিন্তু খাম্‌খেয়ালী রাজা যেমন প্রজাকে যা ইচ্ছে খুসী দিয়ে খুসী করতে পারে, অথচ আবার তদ্দণ্ডে কেড়ে নিতেও পারে, অথচ সে রাজার সেই খামখেয়ালকে কেউ ভাল বোলে স্বীকার কর্‌বে না, এ’ও তাই। আচ্ছা প্রকৃত বলুন, শচী শোকে আপনি কি ব্যথা না পেয়েছেন, আপনার মন কি বলে? এই ব্যথা দেওয়ার জন্যও কি দয়াময়কে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দেয়?”

সৌদামিনী দুইমাস হইল কাশী আসিয়াছেন, বিজয় গুরুদেবের সহিত দেশ ভ্রমণে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, সুতরাং আজ তিনি গুরুদেবের সহিত সৌদামিনীর বাসায় দেখা করিতে আসিয়াছেন।

সৌদামিনী কহিলেন, “কি আর ক’র্‌বো বলুন? তাঁর দেওয়া, তাঁরই নেওয়া, আমরা চোখের জলে ভেসেই হোক্, বা হাসি মুখেই হোক্, তাঁর দান নিতে বাধ্য বৈ কি। তাঁর বিধানের রহস্য, অজ্ঞ প্রাণী আমরা কি বুঝ্‌তে পারি; শুধু চোখের জলে ভেসে, তাঁর পায়ের তলায় শান্তি চাই; তিনি তাই আমাদের দিন্।”

বিজয় প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “হোলো না, হোলো না, এ তো ঠিক্ উত্তর হোলো না বেয়ান ঠাক্‌রুণ, এ তো সেই নিরীহ অত্যাচার-ক্লিষ্টের কথা। আমরা দুর্ব্বল প্রাণী, তাঁর আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই, সুতরাং মন প্রাণ

যতই বেদনা -হত হোক্। তবু কাঁদা আর ব্যথা পাওয়া ছাড়া আর আমাদের কোনো উপায় নেই, আপনাদের সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে তাই একবার ডেকে ব'ল্‌তে ইচ্ছে হয়, যখন তোমার বিরুদ্ধে একটি কথা বল্‌বার ক্ষমতা আমাদের রাখনি, ওগো নিষ্ঠুর! শোক দেবার সময় এর তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি কেন ক'র্‌লে? আমরা বেদনায় ছট্‌-ফট্‌ করি, আর হে রুদ্র! তাই দেখে সৃষ্টির আনন্দে বুঝি তুমি পরিপূর্ণ হোয়ে ওঠো?" সৌদামিনী কিছু উত্তর দিল না। বিজয়ের পুত্রশোক, আজ তিন চারি বৎসরে যে শোক তিনি কতকটা সহিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; নূতন করিয়া সে শোক অনুভব করিয়া কাতর হইলেন। গুরুদেব প্রাঙ্গণে বেড়াইয়া-বেড়াইতে ছিলেন, বিজয় তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মানুষের জীবন আগাগোড়া একটা নিগূঢ় রহস্য-পূর্ণ ব'লে শুধু মনে হয়। আমি মূর্খ, আমি অবিশ্বাসী, তা'তেই হয় তো কিছু বুঝ্‌তে পারি না, চোখের সামনে একটা কাল পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। আপনি গুরুদেব অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছেন, অনেক দেশ ভ্রমণ ক'রেছেন, এত আপনাকে প্রত্যহ সাধা সাধি ক'র্‌ছি, আপনিও তো কোনো কিছু ভেঙে বুঝিয়ে দেন্‌ না; আজ কিন্তু আর ছাড়্‌ছি না, আমাদের জীবন-ব্যাপী জটিল সমস্যা— আপনাকেই আজ আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে,—"

এই সময় হাত পায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিতাই আসিয়া আঙিনায় বসিয়া পড়িল, বিজয় কহিলেন, "সকাল থেকে কোথা গেছ্‌লি নিতাই, তোকে কত খুঁজ্‌ছিলুম যে।"

"আর দাদাবাবু, রাস্তা দিয়ে চ'লে যাচ্ছি, এক মাড়োয়ারী ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিলে, তারপর আট আনা বক্‌সীস্‌ও

দিলে, দিব্যি চাল-ডাল কিনে খিঁচুড়ীর জোগাড় রেখে তোমার কাছে এলুম।"

বিজয় কহিলেন, "নিতাই, তুই আমার কে তা জানি না, নিজের জন্যে না হোক্, রাত পোহালেই একটা না একটা উপায়ে কিছু রোজগার ক'রে, আগে আমার খাবার জোগাড় কোরে রাখ্‌বি,—ধন্য তুই।"

গুরুদেব কহিলেন, "দেখ বিজয়, এ'ও কি সেই প্রেমময়ের লীলা নয়? তোমরা কেউ কারো আত্মীয় নও, স্বজাতী বা স্ব-শ্রেণী নও, তুমি ভদ্র সন্তান ও ইতর নীচ জাতি, কিন্তু তবু তোমাদের মধ্যে কি এক নিবিড় স্নেহ-বন্ধন! আরও দেখ, আমাদের হাতে কপর্দ্দক পুঁজি নেই; কিন্তু এই নিতাইকে উপলক্ষ কোরে দিব্যি তু'বেলার অন্ন সংস্থান হোয়ে যাচ্ছে,—"

বাধা দিয়া বিজয় কহিলেন, "তার জন্যে কি প্রেমময়ের প্রেমকে ধন্যবাদ দিতে হবে? অসহায় সন্তানের ভরণ-পোষণ না ক'র্‌লে বরং পিতা-মাতাকে তিরস্কার ভাগী হ'তে হয়, কিন্তু তাদের লালন-পালন করার জন্যে তো তাদের কিছু বাহাদুরী প্রকাশ হয় না;—আমরা তাঁর সন্তান, আমাদের অন্ন সংস্থান তিনি ক'র্‌বেন না তো আর কে ক'র্‌বে? কিন্তু আবার বলি, কাল গঙ্গার ধারে দেখ্‌লুম, সারিসারি কতকগুলা ভিখারী ব'সে আছে, তু-জন তার মধ্যে কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ, কার বা চোখ নেই, কেউ বিকলাঙ্গ, এই রকম, এরা সবই প্রভুর সন্তান, কিন্তু তিনি কেন এদের এ ভাবে সৃষ্টি কোরে, জীবনগুলোকে দুর্ব্বহ বোঝার মতন এ হতভাগাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন? বেচারাদের ভিক্ষা ক'র্‌তে যাবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই, গাছতলায় প'ড়ে রোগের যাতনায়, ক্ষুধার তাড়নায়

ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে, তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে কে ব'ল্‌তে পারে, 'হে ভগবান! তোমার দয়া অনন্ত, তোমার প্রেম অনন্ত'!—অন্ততঃ আমার মতন বেহায়া মুখ ফোঁড় লোকগুলো তো পারে না?"

নিতাই কহিল, "আর দাদাবাবু, তুমি আবার সেই ক্ষেপা ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেসা ক'র্‌ছ, সে এক মহা-পাগ্‌লা, তার নিজেরই মাথার ঠিক নাই, তা ...কাজের ঠিক্‌ থাক্‌বে কি? খেলার ঝোঁকে যা খুসী তাই কোরে ব'স্‌ছে।"

সৌদামিনী কহিলেন, "নিতাই বেঁচে থাক্‌ বাবা, বেশ বলেছ, ঠাকুর আমাদের লীলাময়, তাঁর লীলার আদি নাই, অন্ত নেই, যখন যা খুসী কোরে ব'স্‌ছেন।"—বলিয়া যুক্ত করে দেবোদ্দেশে প্রণাম করিলেন, বিজয় কহিলেন, "আপনি তো ভক্তি-ভরে প্রণাম ক'র্‌লেন, কিন্তু বলুন দেখি তাঁর এই সর্ব্বনেশে খেলার চোটে, আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের কি দুর্গতি? আমি জানি, আপনারা ব'ল্‌বেন, এ জীবনও ক্ষণস্থায়ী এ সুখ দুঃখও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তা হোলেও, এই যে মানব জীবন সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল, এই যে মানুষের নানারূপ চিত্ত-বৃত্তির বিচিত্র ভাব, এর কি কোনো সার্থকতা নেই—কোনো মূল্য নেই?"

গুরুদেব কহিলেন, "বিজয়, খেপার মতন কাকে বুঝ্‌তে চাইছ, কার কার্য্য প্রণালীর বিচার ক'র্‌তে চাও? আর বোঝাবেই বা কে? যিনি 'অবাঙ্মানস গোচরম্‌' তাঁর বর্ণনা, কার সাধ্য ক'র্‌বে বৎস? জীবন ভোরে শুধু দেখে যাও, সুখ হোক্‌, দুঃখ হোক্‌ অকুণ্ঠিত ভাবে ভোগ কোরে যাও; ধীরে ধীরে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা নিজের মধ্যেই আবার সমাধান হয়ে যাবে; এর জন্য কারও কাছে ছুটোছুটি ক'র্‌তে হবে না। পরের ধার করা বিচার-বুদ্ধির কাছে এর মীমাংসা চেয়ো না, তাতে তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, অথচ নিজে যখন শান্ত বা তৃপ্ত হবে,

তখন যদি আর এক জনকে এই রকম অশান্ত বা উদ্ধত দেখ, তা'তে তুমি বিরক্তও হবে না বা তাকে অশ্রদ্ধাও ক'র্‌বে না, আমার কাছে কি উপদেশ চাও বিজয়? কি বুঝেছি আমি, কি জানি আমি, যে তোমায় আমি ভেঙে সব বোঝাতে পারি? চিরজীবন ছাত্রের পদেই রইলাম, তোমরাই স্বেচ্ছায় আমায় গুরু পদে বরণ করেছ, নচেৎ সে স্পর্দ্ধা আমার নেই বিজয়। সংসারে কঠিন আঘাত খেয়ে তোমার মনের মধ্যে আজ যে বিপুল সমস্যারাশি পুঞ্জীভূত হ'য়ে বিদ্রোহ বাধিয়েছে; তাদের শান্ত কর্‌বার মত বিদ্যা-বুদ্ধির স্পর্দ্ধা আমার নেই। শুধু এইটুকু আমি ব'ল্‌তে চাই,—অধীর হ'য়ো না, উতলা হ'য়ো না, একদিন তোমারও ক্ষোভ শান্ত: হবে, একদিন তোমায়ও ব'ল্‌তে হবে,—আজ শুধু অন্ধকার দেখ্‌ছি না, কাল পর্দ্দা সরে গিয়ে আলোর প্রকাশ আজ আমার দৃষ্টিকে আনন্দিত করেছে গো, করেছে। জন্ম-মৃত্যুর মিলন রেখা একদিন তোমার চ'ক্ষে আর নিতান্ত অশোভন না হ'য়ে প্রশান্ত সুন্দর রূপেই ফুটে উঠ্‌বে। এর বেশী তোমায় আর কিছু বল্‌বার অধিকার নেই আমার বিজয়।"

ইহার উত্তরে বিজয় আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁ'র অধীর চিত্তের শত শত ব্যাকুল উদ্ধত প্রশ্নগুলি মাথা নত করিয়া অন্তর-শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

২৮

শোকের তীব্রতা কালের শীতল-প্রলেপে ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসে; নহিলে সংসারে মানুষ বাঁচিত কি করিয়া! এ

কয়মাসে পুঁটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, দুঃখীকে লইয়া সে একরকম দিন কাটাইয়া যাইতেছে। বাবা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, দু' একমাস অন্তর হয়ত একখানি পত্র লেখেন, পুঁটি সেজন্য বড় উতলা হয়, পূর্ণেন্দু সান্ত্বনা দিয়া বলে, "বিজয়, বাবা দেশে দেশে ঘুরে বেশ ভালই আছেন, তাঁর জন্যে তুমি ভেবনা পুঁটি, বরং নূতন নূতন দেশের নব নব দৃশ্য তাঁকে যথেষ্ঠ আনন্দ দিচ্ছে, দেশ ভ্রমণে মনের চিন্তা-শক্তি উন্মেষিত হয়, মানুষের অন্তর্দৃষ্টি এতে যথেষ্ট খুলে যায়, তা ছাড়া এতে মানুষ শুধু নিজেরই সুখ দুঃখের ভাবনা ভুলে পরের জন্য অনেক খানি ভাবতে শেখে।"

পুঁটিও ইহাতে আশ্বস্ত হয়, ইতিপূর্ব্বে সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখন পূর্ণেন্দুর আগ্রহে আবার পুঁথি খুলিয়া বসিয়াছে, পূর্ণেন্দুর শিক্ষা দানে বড় আগ্রহ, স্ত্রীকেও কাছে পাইয়া শিখাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুরমার ইহাতে মোটেই আগ্রহ নাই—সে স্পষ্ট বলিয়া দিত, "আমায় তো আর চাকরী ক'র্‌তে যেতে হবে না, যে বুড়ো বয়সে আবার প'ড়তে সুরু ক'রবো! কলেজে গুরুগিরি ক'র্‌ছ সেই ঢের, আমার কাছে পণ্ডিতী ফলাতে এস না, হাতা-খুন্তীর ভয় রেখ'।"

বাঙ্গালীর ছেলে, একেই ভয়-তরাসে, ছোট বেলা হইতেই জুজু-বুড়ীর ভয়ে তাহারা অস্থির, তাহার উপর হাতা-খুন্তীর ভয়টা বেশী রকম সাংঘাতিক, অল্পবিস্তর এ ভয় সবারি অন্তরে প্রবল, সুতরাং পূর্ণেন্দুকে হাল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল, তবে এখন পুঁটিকে পাইয়া সে উৎসাহের সহিত পড়াইতে লাগিল, পুঁটি বেশ বুদ্ধিমতী, সে খুব শীঘ্রই উন্নতি করিয়াছে দেখিয়া পূর্ণেন্দুরও আনন্দ হইতে লাগিল।

পুঁটি একদিন সুরমাকে কহিল, "বউ-দি, দাদা এত পড়াশুনা ভালবাসেন, তা তুমি পড় না কেন ভাই? তুমি গল্প শুনতে ভালবাস, ইংরিজি বাঙলা ভাল ক'রে শিখলে, কত ভাল ভাল গল্পের বই প'ড়তে পার।"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "আমার বিদ্যে শেখবার দরকার কি লো, উনি তো এক বিদ্যের জাহাজ, সেই জাহাজ নিয়েই অস্থির, তার ওপর আমার বিদ্যে বোঝাই ক'রে রাখব কোথায়? তুই খুব মত শেখ, শিখে খুব পণ্ডিতণী হ।"

পুঁটি আর ইহার কি জবাব দিবে? প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পূর্ণেন্দু দুঃখীকে বেড়াইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিত, দুঃখীকে খাওয়াইয়া আনিয়া পুঁটি গল্প বলিত, ছবি দেখাইত, কোনও দিন বা—অ—আ ক—খ পাঠাভ্যাস করাইতে বসিত, পাশের ঘরে সুরমা ও পূর্ণেন্দুর গল্প জমিয়া উঠিত। গৃহে গুরুজনের বালাই ছিল না, সুতরাং যুবক-যুবতীর হাস্য-পরিহাসে গৃহ মুখর হইত, সে শব্দে থাকিয়া থাকিয়া পুঁটির মন চমকিয়া উঠিয়া উদাস হইয়া যাইত, দুঃখী ঘুমাইয়া পড়িলে সে আর কিছুতে মন স্থির করিতে পারিত না, নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা তাহার বুকে হা হা করিয়া উঠিত, অভাগিনীর মনে হইত; তার স্বামী বাঁচিয়া থাকিলে সেও আজ স্বামীর আদরে আদরিণী হইয়া মাতৃ-বিয়োগ যাতনা, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ যাতনা অনেকখানি ভুলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হায় ভগবান্! এ সংসারে তাহার আঁকড়িয়া ধরিবার একটা কিছু অবলম্বন রাখিলে না প্রভু! কোন অপরাধে অভাগিনী বালিকাকে এমন করিয়া রিক্ত, বঞ্চিত করিলে দেব? তোমার সোণার হাটে পা দিতে না দিতেই তার মাথার পূর্ণ পসরা এমন করিয়া ছিনাইয়া

লইলে? হে বিচারক! এই কি তোমার ন্যায় বিচার? শরতের চাঁদ—জানালা দিয়া অনেক খানি শুভ্র আলোক-ধারা ঘরের মধ্যে ঢালিয়া দিত, পুঁটি মৃত স্বামীর মুখ স্মরণ করিতে চেষ্টা পাইত, কিন্তু অতি অস্পষ্ট সে স্মৃতি, বাষ্পভারাকুলনেত্রে বালিকা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিত, "ঠাকুর! কিছু দাও আমায়, বড় খালি, বড় শূন্য বুক, কিছু এর ভ'রে দাও প্রভু। নইলে আমায় ডেকে নাও; এমন ক'রে তো আর বাঁচতে পারি না।"

কখনও বা ঘুমন্ত দুঃখীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ভাবিত, "এই আমার অবলম্বন, এই সেই আমার সতীশ।" কিন্তু তখনি সতীশের মুখ স্মরণ করিয়া ঝর্ ঝর্ তার দুনয়নে ধারা বহিত।

পূজার বন্ধে প্রফুল্ল কটকে বেড়াইতে আসিল, পুঁটিকে সে চিরদিনই স্নেহ করে, পুঁটিও তাহাকে মান্য করে, অসঙ্কোচে কথা বার্ত্তা বলে। প্রফুল্ল একদিন পুঁটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পুঁটি, ছোট মেয়েরা বিধবা হ'লে আবার তাদের বিবাহ হওয়া উচিত কিনা বল দেখি?"

পুঁটি চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "সে আমি কি জানি প্রফুল্ল-দা?"

"আচ্ছা পুঁটি, তোমার জীবনটা তুমি কিরকম ক'রে কাটাবে ভেবেছ?"

হায়—হায়, পুঁটি তার কি জানে? সত্য কথা বলিতে গেলে, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে গেলে, সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, কি নিবিড় সূচিভেদ্য তিমিরাচ্ছাদনী—তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর ঢাকা রহিয়াছে, কোথাও একটু আলোক রেখা নাই। সমবেদনায় প্রফুল্লর হৃদয় ভরিয়া উঠিত, তার সহৃদয়তায় গলিয়া গিয়া পুঁটি যেন আশ্বস্ত হইত, মনে মনে ভাবিত, প্রফুল্ল-দা আমার কত শুভাকাঙ্ক্ষী।

কিন্তু এমনি করিয়া সহৃদয়তার সংযোগে যখন উহাদের দুইটি তরুণ অবিবেচক হৃদয় দিনের পর দিন নিকটতর হইয়া আসিতে-ছিল; উহারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তার পর ছুটি ফুরাইয়া গেলে প্রফুল্ল যখন বিদায় লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া গেল, তখন হু হু করিয়া পুঁটির চোখে জলের ধারা বহিল, সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, প্রফুল্লর জন্য এই যে অনাবশ্যক অশ্রুপাত —ইহার কারণ কি? ইহা কি অসম্ভব বা অন্যায় আতিশয্য নয়?

২৯

সুজাতা নিজের পাঠ গৃহে বসিয়া কি একখানা চিঠি লিখিতে-ছিল, পিছনে রমলা দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে তাড়া দিতেছিল, "লেখা শেষ হ'লো সুজাতা?"

সুজাতা বিনা বাক্য-ব্যয়ে আরও কয়েক মিনিট ধরিয়া চিঠি খানি শেষ করিয়া কহিল, "দাঁড়াও রমলা, এ'টা ডাকে পাঠিয়ে আসি, প'রশু দুপুরের ট্রেণে আমরা কটক্ রওনা হচ্ছি, পূর্ণ-দা আগে থেকে খবর পেলে আমাদের receive কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে পার্‌বেন।" রমলা চোখ টিপিয়া একটু হাসিল মাত্র, জবাব দিল না, সে হাসির প্রতি দৃকপাত না করিয়া সুজাতা চলিয়া গেল, পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তারপর মাধুরীর খবর কি ভাই? বিয়ের পরই বরের সঙ্গে বম্বে চলে গেল, আমায় এক খানা চিঠিও লিখ্‌লে না, ছোট বেলা কার এদ্দিনের ভাব, কোথা কার কে এক অচেনা লোকের পাল্লায় প'ড়ে এখন সব ভুলে গেল।" রমলা হাসিয়া কহিল, "এমনিই ভগবানের লীলা।"

সুজাতা কহিল, "তা ব'ল্‌বে বৈ-কি, তুমিও তো দু-দিন বাদে ঐ পথের পথিক হ'তে চ'লে,—আমিই একা রইনু বাকী।"

রমলা কহিল, "তা যদি ব'ল্লে সুজাতা, তোমার মা সে দিন আমাদের বাড়ী গিয়ে দুঃখ ক'রছিলেন যে, সুজাতার ক্লাস-ফ্রেণ্ড যারা সবাই কেমন এক এক জোরে বিয়ে ক'র্‌লে, কেবল সুজাতাই বিয়ে ক'র্‌তে চায় না, দু-একটি ভাল পাত্রও ঠিক ছিল, তা কাউকেই ওর পছন্দ না। বলে, "বিয়ে ক'র্‌লে তোমরা পর হয়ে যাবে মা, এ তোমাদের কাছে বেশ আছি।"

নিভা-দি' সেখানে ছিলেন, ব'ল্লেন বিয়ে না করাই ভাল, এ বেশ স্বাধীন ভাবে আছি, বিয়ে কোরে আগা-গোড়া কেবল পর-বশ হওয়া। স্বামী-শাশুড়ীর মন যোগাও, হুকুমে চল, তার ছেলে-পুলে পেটে ধর, মানুষ কর, তার ওপর—আজ এ ছেলের রোগ, কাল তা'র সর্দ্দি-কাশী, নানা ঝঞ্ঝাট, এর চাইতে চির-কুমারী হোয়ে বেশ থাকা যায়।"

সুজাতা কহিল, "কিন্তু আমি তো সে জন্যে বিয়ে করতে চাই না, তা নয়; মায়ের দল বুঝি আমারও ঐ principle ধরে নিয়েছেন, কিন্তু তুমি তো জান রমলা, নিভা-দি'র সঙ্গে এ বিষয়ে আমি এক মত নই; নারী যখন স্বামীর সেবা বা সন্তানের সেবা করে, সে সেবা তো দাসীর সেবা নয়, যে তাতে অপমান বা ক্ষোভ কি বিরক্ত থাকবে? যে সেবা প্রেম বা স্নেহে পরিপূর্ণ, তার দাম যে বড় বেশী, এমন কি তা অমূল্য, ও রকম কথা যদি আমরা ভাবি, তা হোলে, নিজেরাই আমরা নিজেদের খর্ব্ব কোরে ফেলি, অপমান করি, এ ছাড়া আর কি বলি?"

রমলা কহিল, "কিন্তু সুজাতা,—"

"এর পর আবার কিন্তু কি ?"

"আমারও বিয়ে করবার নামে ভয় হোতো, কিন্তু মাষ্টার মল্লিকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে সে ভয় ভেঙে গেল।"

সুজাতা হাসিয়া কহিল, "আমার কিন্তু ভয় টয়ের বালাই নেই, সুতরাং ভয় ভাঙবার দরকারও হবে না—"

"তবে তুমি বিয়ে ক'রতে চাইছ না কেন ?"

"এ কেনর উত্তর নেই। আমি তো প্রতিজ্ঞাও করিনি যে চির-কুমারী থাকব, হয় তো এর পর ক'রতেও পারি।"

"আমার একটা কথা মনে হয় সুজাতা।"

"কি, শুনতে পারি ?"

"তুমি হয় তো কাউকে লুকিয়ে ভালবাস।"

সুজাতা হাসিয়া কহিল, "romantic! কে সে ভাগ্যবান ?"

"নাম করি ? চ'মকে উঠো না," তার পর বার দুই ঢোক গিলিয়া, চোখ টিপিয়া, রমলা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "পূর্ণেন্দু"।

সুজাতা সখার নিষেধ স্বত্বেও চমকিয়া উঠিল, তারপর কহিল, "বা রমলা, খুব এঁচে নিয়েছ ত ? তারপর এটা শুধু তোমারি ধারণা, না আর কারও উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফল এ সত্য ? কেন না, তোমার মনে একথা উদয় হ'লে, কোনো না কোনো দিন তুমি আমার কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলতে।"

"তা ভাই সত্যি বলতে কি, আমি অতো শতো ঠাওরাই নি, প'রশু দিন রাণীদের বাড়ী মার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখি, তোমার মা ও বেড়াতে এসেছেন, রাণীর মা-ই তোমার বিয়ের কথা তুললেন, তোমার মা ব'ল্লেন, "মেয়ে যে বিয়ে ক'রতে চায় না দিদি, নইলে কি আমার অসাধ যে একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে না দিই!" তাতেই

রাণীর মা ব'ল্লেন্, "হয় তো পূর্ণেন্দুর ওপরে ওর মন প'ড়েছিল, তাই আর বিয়ে ক'র্‌তে চায় না, তোমাকে আগে থেকেই বলেছিলুম, হিন্দু-বাড়ীর যুব ছেলে ঘরে রেখো না, উপযুক্ত মেয়ে ঘরে থাক্‌লে ওসব বিষয়ে খুব সাবধান হ'য়েই চল্‌তে হয়, বিশেষ যখন বিবাহিত ছেলে।"

সুজাতা মুখ কাল করিয়া কহিল, "তখন নিশ্চয়ই এই সব নিয়ে খুব তর্ক আলোচনা চ'ল্‌ল, আর ক্রমে সে কথা মুখে মুখে এ বাড়ী ও বাড়ী হ'তে হ'তে যায় এ দেশ ও দেশও যে হবে না, তাও নয়। কিন্তু ধন্য রাণীর মার আবিষ্কার শক্তি, কল্পনাতে এঁরা বড় বড় উপন্যাসিককেও দেখ্‌ছি হার মানাতে পারেন।"

রমলা কোনো কথা কহিল না, সুজাতার গম্ভীর স্বভাবকে সে ভয় করিত। কিছুক্ষণ গৃহ নিস্তব্ধ, এই সময়, সুলোচনা দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সুজাতা, মণিন্দ্র এসেছে। সে ব'ল্‌ছে, গিরিডি যাওয়াই ভাল, তা হোলে কটকে আর আমাদের যেয়ে কাজ নেই। গিরিডি যাওয়ারই ব্যবস্থা করি।"

সুজাতা কহিল, "কেন মা, কটকই চল না, পূর্ণ-দা কে চিঠিও লিখে দিয়েছি, তিনি প'রশু আমাদের জন্যে ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে আস্‌বেন, কটক জায়গাও ভাল।"

মাতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু পূর্ণেন্দুর বাড়ী যাওয়া কারু মত নয়, বিশেষ তুমি এখন ছোটটি নও,—"

বাধা দিয়া সুজাতা কহিল, "কিন্তু মা, দু'বৎসর আগেও আমি ছোটটি ছিলাম না, পূর্ণ-দা'কে আমি নিজের ভাইদের মতন ব'লেই জানি, সেই রকম শ্রদ্ধা সম্মানও করি, অথচ তাঁকে উপলক্ষ কোরে আমার সম্বন্ধে যে কথা উঠেছে, তা শুনে আমি নিজের জন্যে না

হোক্, যাঁরা এ রকম অন্যায় আলোচনা করেন, তাঁদের জন্য লজ্জা বোধ ক'র্ছি ; তা ছাড়া তুমিই বা কেমন কোরে এসব কথা বিশ্বাস ক'র্লে মা।"

মা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু মা, একটু বুঝে শুনেও তো চলা উচিৎ, হিন্দু-ছেলের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌বো, তাদের অভিভাবকরা ও তো পাঁচ কথা ব'ল্‌তে পারে, এ রকম স্থলে পাঁচ জনের পরামর্শ না নিয়ে কাজ ক'র্লে শেষে দায়ে ঠেক্‌লে কেউ আর sympathy ক'র্বে না।"

সুজাতা কহিল, কিন্তু মা, মনে আছে তো ; ভাইদের যখন ঐ সব খারাপ ব্যারাম হ'লো, তা'দের রোগ শয্যায় কেউ তখন নিজেদের ছেলেদের ঘেঁস্‌তে দেন নি, কিন্তু কোথাকার কে এক হিন্দু ছেলেই প্রাণ ঢেলে সেই সব রোগীর কি সেবাটাই না করেছে। তোমার সমাজের শাসন তখন তো তুমি না মেনেও সেই হিন্দু-ছেলেকে যত্নের সহিত ঘরে রেখেছিলে ; অথচ এখন সমাজের লোকের ভয়ে তাঁর বাড়ীতে যেতে চাইছ না, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি লোকের কথা শুনে আমার জন্যে ভয় পাচ্ছো। ভয় কর্‌বার কোনো কারণ নেই, পূর্ণ-দা'কে আমি ভালবাসি, সম্মান করি, কিন্তু তা ছোট বোনের—বড় ভায়ের প্রতি যে ভালবাসা, তা ছাড়া আর কিছু নয়, এখন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁরা, তাঁরা আর বেশী আমাদের জন্যে উদ্বিগ্ন না হ'লেই মঙ্গল।"

সুলোচনা বুঝিলেন, "কন্যার মত টলিবে না, পূর্ণেন্দুর প্রতি তাঁর ও যথেষ্ট বিশ্বাস ও স্নেহ ছিল, সুতরাং কটক যাওয়াই স্থির করিয়া উঠিয়া গেলেন, সুজাতা মৃদু হাসিয়া রমলার দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন ভুল ভাঙ্‌ল ? কিন্তু রাণীর মার মতন

আরও আমাদের মধ্যে দু পাঁচজন আছেন; যাঁদের ভুল কিছুতেই ভাঙ্‌বে না, আর এ রকম উল্টো পাল্টা ভুলের সৃষ্টি ক'র্‌তে যাঁরা বড় ভালও বাসেন।"

৩০

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, গৃহবাসী সকলেই সুখ-সুপ্ত, কেবল পুঁটি নিজের বিছানায় শুইয়া মানসিক উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, পাশে বালক দুঃখারাম গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, কেবল অভাগী পুঁটির চ'ক্ষেই ঘুম নাই, আদি-অন্তহীন কত চিন্তাই তা'র মাথার মধ্যে তোলপাড় খাইতেছে। কি পাপ করিয়াছিল সে, যে বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল; যদি জন্মিল তো বিবাহের রাত্রেই বিধবা হইল কেন; তা যদি হইল, তাহা হইলে, সোণার চাঁদ সতীশের পরিবর্ত্তে, সে কেন মরিল না? আর যদি বা না মরিল; প্রফুল্ল আবার মরিতে গিয়া তা'কেই বা ভাল বাসিল কেন? দেশে কি মেয়ের অভাব, যে প্রফুল্ল তাহাকে ভালবাসিয়া বিধবা বিবাহ করিতে চায়? ছি—ছি, এ দুর্ম্মতি তা'র কেন হইল? পুঁটি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, স্তিমিত প্রদীপকে উজ্জল করিয়া দিয়া, বালিসের নীচে হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল, সে খানি প্রফুল্লর লেখা। সে লিখিতেছে,—

"পুঁটি, আমার চিঠি পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ো না। তুমি জান, তোমায় আমি বরাবর অন্তরের সহিত স্নেহ করি, তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমার বড় কষ্ট হয়, তুমি রাজী হও তো তোমায় আমি বিবাহ করিতে পারি, বিদ্যাসাগর মতে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়, তোমায়

আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তুমি বাস কি না জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বাসিতে পার, শীঘ্রই আসিতেছি, সাক্ষাতে পত্রের উত্তর চাই।"

"গৃহ নির্জ্জন হইলেও পুঁটির চোখ মুখ যেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, প্রফুল্ল কি পাগল হইয়াছে, তাই এই ভাবে চিঠি লিখিয়াছে! এর আবার কি না সে উত্তর চায়? কি লজ্জা, গুরুজনরা শুনিলে পরে কি করিবেন, কি ভাবিবেন, প্রফুল্লকে কি পাগলা গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন না? আর কালামুখী পুঁটিকেই বা পাঁচ জনে কি বলিবে? সে সর্ব্বনাশীই যত নষ্টের মূল, কিন্তু তখনই পুঁটির মনে হইল,—সে কি করিল? সে তো নিতান্তই নিরপরাধ, তার রূপ নাই, গুণ নাই, সুতরাং কেহ বলিতে পারিবে না, যে এই সবে সে প্রফুল্লর মন ভুলাইয়াছে। সে কিছু প্রফুল্লকে ভালও বাসে না—কিন্তু এই খানে পুঁটি থামিল, নিজের মনের ভিতরটা বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। কিন্তু কই? মন বেশ বাঁকা হইয়া বসিল, সে তো কই, সাদা-সিদা ভাষায় সহজ সুরে বলিতে পারিল না যে—"না আমি প্রফুল্লকে একটুও ভালবাসি না, সে আমার কে, যে তাকে ভালবাসিতে যাইব?" বরং সে বলিয়া ফেলিল, "যদি কেউ যেচে এমন প্রাণ ভরা ভালবাসা আমায় দিতে আসে, আমি নেবনাই বা কেন? আমার কি আছে যে যার গুমোরে আমি অমন জিনিষ পায়ে ঠেলে ফেলে দেবো? ভবের হাটে ভিখিরী আমি, সোণা পেলে, কেন না যত্ন কোরে আঁচলে তুলে গেরো দিয়ে বাঁধ্‌ব?" পুঁটির চক্ষে জল আসিল। হায়—হায়, একি ঘৃণার, লজ্জার কথা! অবিশ্বাসী, নিমক হারাম মন, শেষে কি না এই তার ব্যবহার? হারে অকৃতজ্ঞ; মন

কিন্তু তীব্র সুরে অনুযোগ করিল—অকৃতজ্ঞ সে কিসে হইল? কি এমন জিনিষ সে এ জীবনে পাইয়াছে, যাহার জন্য কৃতজ্ঞতা অপলাপের অপরাধে সে দোষী হইল?

পুঁটি আলো নিভাইয়া দিয়া, আবার গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল মুখে লেপ ঢাকা দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপন মনে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আর ঈশ্বরের চরণে মৃত্যু ভিক্ষা করিল—সংসারে তা'র বাঁচিয়া থাকার কোনো দরকার নাই। হে ভগবান্! দয়া কোরে তুমি তাকে তা'র মায়ের কাছে, ভায়ের কাছে ডেকে নাও!—বালিকার সে কাতর প্রার্থনা কে শুনিল তা কে জানে?

ক্রমে সে নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল,—যেন প্রফুল্লর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, প্রফুল্ল বাজনা বাজাইয়া নব বধূ লইয়া বাড়ী আসিয়াছে, নূতন বউ দেখিবার জন্য লোকের খুব ঠেলাঠেলি, ভূতি ও শোভা তাড়াতাড়ি আগে আসিয়া "নূতন বৌয়ের মুখ দেখি, কেমন বউ আন্‌লে দাদা?" বলিয়া পুঁটির ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিল, পরক্ষণেই পিছু হটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কহিল,"এ কি, এ যে পুঁটি রাক্‌সী! বিয়ের রাত্রিতে স্বামীর মাথা খেয়ে সাধ মেটেনি, এখানে আবার ম'র্‌তে এসেছে।" তারপর চারিদিক হইতে সে কি তুমুল কোলাহল ধ্বনি উঠিল; অজস্র বর্ষা-ধারার ন্যায় অভিসম্পাত, আর তিরস্কার বাণী পুঁটীর উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল, পুঁটির যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল, এই সময় হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ চাহিতেই দেখিল,—সকাল হইয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! প্রফুল্লর সেই চিঠি খানা বিছানাতেই সে ফেলিয়া রাখিয়াছিল; সুলোচনা পুঁটিকে ডাকিতে আসিয়া সেই চিঠি পড়িয়া ফেলিয়াছেন, পুঁটিকে চোখ চাহিতে দেখিয়া কহিলেন,

"উপাসনার সময় হয়েছে মা, তোমায় ডাকতে এসে চিঠি খানা নজরে প'ড়ে গেল। ইচ্ছে ক'রে যে পড়ে ফেল্‌লুম তা নয়, তাতে আর লজ্জা কি ; প্রফুল্ল তো সোণার চাঁদ ছেলে, তুমিও দুধের মেয়ে এই বয়েসে বিধবা হয়েছ, সে যদি তোমায় ভালবেসে বিয়ে করে, সে তো ভালই।" পুঁটি ধড়-মড়িয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, তার সমস্ত মুখ ভয়ে ও লজ্জায় কাল হইয়া গেল। তার সর্ব্বদেহ যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সুলোচনা লক্ষ্য করিয়া শশব্যস্তে পুঁটির মাথায় পায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, "ভয় কি মা, আমি কাউকে কিছু ব'ল্‌ছি না, তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে আমায় স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস কোরো বলতে পার।" এই টুকু সান্ত্বনাপূর্ণ সস্নেহ বাণী শুনিতেই পুঁটির দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িল।

৩১

সুজাতা পিতা-মাতাকে লইয়া আজ কয়েক দিন হইল কটকে পূর্ণেন্দুর নিকট আসিয়াছে। নিবারণ বাবু এই এক সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতা অপেক্ষা এখানে অনেকটা ভাল আছেন, পূর্ণেন্দু, ইহাদের কাছে পাইয়া বড় খুসী হইয়াছে। বিদেশে অধ্যয়ন করিতে গিয়া এই স্নেহময় পরিবারে সে যে স্নেহ যত্নের ঋণে বাঁধা পড়িয়াছিল, তাহা যে পরিশোধ্য নহে ; তাহা পূর্ণেন্দু ভালরকমই জানিত, যেহেতু সে স্নেহ যত্ন তো লৌকিকতা বা কৃত্রিমতার দিক দিয়া ছিল না, তাহা অন্তঃকরণের সজীবতায় পরিপূর্ণ ছিল।

পূর্ণেন্দুর চোখে মুখে এমন একটি শান্ত শ্রী ও সরল ভাব দীপ্তি পাইত, যাহাতে তাহাকে খুব সহজেই আপনার করিতে

ইচ্ছা হইত, তার উপর তার স্বভাব ও কথাবার্ত্তাও অতি মধুর ছিল, সুতরাং ঐ দম্পতী এই অপরিচিত অনাত্মীয় যুবককে সহজেই আপনার করিতে পারিয়াছিলেন.। পূর্ণেন্দু কিন্তু কলেজের অধিকাংশ যুবকের ন্যায় মহোৎসাহী ছিল না, সভা সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতির ধার দিয়া সে বড় ঘেঁসিত না, অনেক সময় নিবারণ বাবুর বসিবার ঘরে তাঁহাকে ঘেরিয়া হিন্দু ও ব্রাহ্মণ যুবক দল যখন তর্ক ও বাক্যের উৎস খুলিয়া দিত, পূর্ণেন্দু নীরব-শ্রোতা হইয়া একপাশে বসিয়া থাকিত। নিবারণ বাবু সে জন্য অনেক সময় পূর্ণেন্দুকে মিষ্ট অনুযোগ করিতেন,—যে সব ছেলেদের মধ্যে courage নাই, প্রাণের চাঞ্চল্য নাই, তাহাদের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি যে সুদূর পরাহত, তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। পূর্ণেন্দু এসব কথার উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাসিত মাত্র। সে বেচারী নিতান্তই পাড়াগাঁয়ে সহুরে বাতাস, সহুরে চেতনা তাহাকে মোটেই উদ্বুদ্ধ করিতে পারিত না।

কিন্তু প্রফুল্ল যখন কলিকাতায় পড়িতে গিয়া নিবারণ বাবুর সহিত পরিচিত হইয়াছিল, তাহার কথা বার্তার ধাঁজ ও পাঁজ দেখিয়া নিবারণ বাবু খুসী হইয়া বলিয়াছিলেন, "ছোক্‌রা ভারী Brilliant, চেষ্টা ক'র্‌লে ভবিষ্যতে ওর দ্বারা দেশের ও সমাজের অনেক কাজ হবে।

নিবারণ বাবু আসিবার কয়েক দিন পরে প্রফুল্লও গ্রীষ্ম মাসের বন্ধে আসিয়া জুটিল, পূর্ণেন্দুর সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া মোটেই সুখ নাই, নিবারণ বাবু একটু কথাবার্ত্তা ভালবাসেন, সুতরাং প্রফুল্লকে কাছে পাইয়া তিনি ভারী খুসী, বিদেশে, অবসর সময়টা এইবার কাটিবে ভাল।

সে দিন বৈকালে পূর্ণেন্দু একমনে যখন জানালার ধারে বসিয়া বেঙ্গলী পড়িতেছিল, তখন প্রফুল্লর সহিত নিবারণ বাবুর কথাবার্ত্তা বেশ জমাট বাধিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণেন্দুর কাণে কিন্তু তার এক বর্ণও প্রবেশ করে নাই, প্রফুল্ল যখন তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "পূর্ণ-দা, শুনছ, উনি কি বল্ছেন? বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ব গ্রাসী, বৌদ্ধদের মূর্ত্তি জগন্নাথকে টেনে নিয়ে নিজেদের ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ঐ খানেই কি হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব নয়? হিন্দু ধর্ম্মও যে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক, তা শ্রীক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। যে খাওয়া-ছোঁয়া নিয়ে হিন্দুর এত বাচ-বিচার; উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা যে তাঁরা মানেন না,—তার প্রমাণ, শ্রীক্ষেত্র।"

পূর্ণেন্দু প্রফুল্লর ডাকে মুখ ফিরাইয়া কথা কয়টি শুনিয়া লইয়াই আবার পাঠে মন দিল, কোনো কিছু উত্তর দিল না। নিবারণ বাবু বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্ম কি, উহার উৎপত্তি কোথায়, এবং উহার যথার্থ লক্ষণ ও সংজ্ঞাই বা কি, এ সব বুঝ্‌তে হ'লে, গভীর শ্রদ্ধা ও জ্ঞানেরই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তুমি এখন তরুণ বয়স্ক, কিন্তু তোমার মধ্যে তবু ঐ যে তর্ক করবার ও বোঝবার একটা স্পৃহা রয়েছে, ওটা আমি শুভ লক্ষণ ব'লে মনে করি। ঈশ্বর করুন, তোমার সদ্বুদ্ধি বিকশিত হোক্, সত্য ধর্ম্মে তুমি আস্থাবান হও। কিন্তু একটা কথা, নিজের ধর্ম্মে যদি খুব গোঁড়া হও, তা হোলে, কোনো ধর্ম্মেরই প্রকৃত বিচার কোরে উঠ্‌তে পার্‌বে না।" প্রফুল্ল বাধা দিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু দেখুন, গোঁড়ামীটা নিতান্ত খারাপ জিনিষ নয়, নিষ্ঠা—গোঁড়ামীরই নামান্তর মাত্র। আপনি যে ধর্ম্ম বিশ্বাসী হন্ না কেন, তা'তে যদি আপনার প্রকৃত নিষ্ঠা না থাকে, তা হোলে তো প্রতি পদে লক্ষ্যচ্যুত হবারই ভয়।" পূর্ণেন্দু

বোধ করি এবারে আর মন দিয়া পাঠে নিবিষ্ট হইতে পারে নাই, সুতরাং কাগজ খানা সরাইয়া রাখিয়া কহিল, "কাকাবাবু, আপনি উপাসনা সেরে নিন্, তারপর চা খেয়ে একটু বেড়াতে যাওয়া যাবে, মহেশ বাবুর বাড়ী যাব, ফির্‌তে একটু রাত্রি হ'লেও ক্ষতি নেই, বেশ ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠ্‌বে।"

এমন জমাট তর্কে বাধা পাইয়া প্রফুল্ল বিরক্ত হইয়া কহিল, "পূর্ণ-দা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লেই তুমি কথা ভঙ্গ কোরে দাও, মানব জীবনের এমন অত্যাবশ্যকায় প্রসঙ্গটা কেবল তুমি এড়িয়ে চ'ল্‌তে চাও, এ'টা কি ভাল ?"

সরল প্রাণ নিবারণ বাবু কহিলেন, "সে'টা ঠিক না, ধর্ম্ম ব্যতীত মানুষের জীবন নিতান্ত অসম্পূর্ণ, মানুষ এই অত্যাবশ্যকায় জিনিষ-টাকে যে কোনো আকারে হউক না কেন, নিজের মধ্যে গ্রহণ না ক'র্‌লে চ'ল্‌তে পারে না, এড়িয়ে চলাটা কখনই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "ভাই প্রফুল্ল, তোমার মতন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তর্ক করাটা আমার মোটেই আসে না। যে দিন আমার অন্তরের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব আপনি ফুলে-ফেঁপে উঠ্‌বে, সে দিন তাকে আর চেপে রাখ্‌তে আমার সাধ্য হবে না। যে জিনিষটাকে এখনও আমি অন্তরের মধ্যে মোটে অনুভব ক'র্‌তে পারি নি, অর্থাৎ যার মহত্ব ও পবিত্র ভাব এখনও আমার নাগালের অনেক উঁচুতে; তার সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করাটা আমার ধৃষ্টতা মনে হয় মাত্র।"

ইহার উত্তর দিবার জন্য প্রফুল্ল ব্যস্ত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই পূর্ণেন্দু চটি পায়ে দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিবারণ বাবু মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "এ হ'চ্ছে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-মান্দ্য, এক্টো

ভাল কথা নয়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার অন্তরে ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা জাগ্রত করুন, তখন তিনিই আবার সে ক্ষুধার জন্য তৃপ্তি-খাদ্য ও শান্তি-বারি দান কোরে তোমায় পরিতৃপ্ত ক'র্‌বেন, মানবাত্মা এমনি কোরে তাঁর অপার করুণা লাভে ধন্য হয়।"

৩২

প্রথমে কথাটা কেহ কাহাকেও খুলিয়া না বলিলেও সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, পুঁটি ও প্রফুল্লর মধ্যেকার সম্বন্ধ বড় জটিল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দিন সুলোচনা গোপনে প্রফুল্লকে কথাটা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন্ ও প্রফুল্লর উদ্দেশ্য কি বুঝিতে চাহিলেন, প্রফুল্ল সানন্দে পুঁটিকে বিবাহ করিতে রাজী আছে জানিয়া তিনি খুসী হইলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় পুঁটি, সুরমা, ও সুজাতা সকলেই বেড়াইতে যাওয়ায়, পূর্ণেন্দুর কাছে কথা পাড়িবার ছলে কহিলেন, "পূর্ণেন্দু, নির্ম্মলার বাবা এখন কোথায় ?"

"সম্প্রতি তিনি অযোধ্যায় গেছেন, সেখান থেকে জব্বলপুরে যাবেন, লিখেছেন।"

"নির্ম্মলা কি এখন তোমার কাছেই থাক্‌বে ?"

"আর কোথায় যাবে ? এক ওর মাসী আছেন্ তা ছাড়া সেই খানেই ওর শ্বশুর বাড়ী, তা ওর শাশুড়ীও তো বাড়ী থাকেন না, তিনি প্রায়ই তীর্থে তীর্থে বেড়ান, কাজেই সেখানে গিয়ে একলা থাকেই বা কার কাছে ?"

"কিন্তু তোমার এখানেও যে ওর বেশী দিন থাকা সুবিধা হবে, তা তো মনে হয় না, বউ-মা পুঁটির ওপর বড় সন্তুষ্ট নন্।"

সুরমা বড় আশা করিয়া স্বামীর সহিত বিদেশে আসিয়াছিল যে, এখানে সে সর্ব্বে সর্ব্বা গৃহিণী হইয়া কাল কাটাইবে। বাড়ীর দাস দাসীর প্রতি সে আশ মিটাইয়া প্রভুত্ব করিত; হুকুমের চাকররা মাহিনা খাইয়া নিয়ম মত পুরা দস্তুর সব কাজ বাজাইয়া দিবে, ইহাই সে চাহিত। ইহার ত্রুটি সে সহিতে পারিত না, কিন্তু কোমল-হৃদয়া পুঁটি—ঝির শরীরটা আজ ভাল নাই জানিলে, নিজে ভার হইয়া অর্দ্ধেক কাজ করিয়া দিত, ঝি কিছু খাইতে চাহিলে সুরমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই ভাঁড়ার হইতে মুড়ি, চিঁড়া বাহির করিয়া দিত,—চাকরের প্রতিও সেই ব্যবহার। সুরমা এজন্য যখন পুঁটিকে শাসন ও স্বামীর নিকট এসব বিষয়ের অনুযোগ করিতে লাগিল, তখন পুঁটি অবশ্য সাবধান হইল, কিন্তু এমনি করিয়া দাস দাসী গুলা পুঁটিকে মায়া মমতা করিতে ও কর্ত্রীকে ভয় করিতে শিখিল; সুরমার দৃষ্টিতে ইহা এড়াইল না। সুলোচনাও আসিয়া পর্য্যন্ত এসব লক্ষ্য করিতেছিলেন; তবে তাঁহাকে মান্য করিয়াই সুরমা খুব সাবধানেই পুঁটির সহিত ব্যবহার করিত, তবু এ পরের বোঝা ঘরে রাখিতে সে যে নিতান্তই নারাজ; মেয়েছেলের এ অবস্থায় শ্বশুর বাড়ী থাকাই ভাল, একথা সুলোচনার কাছে স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিত।

পূর্ণেন্দুও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পুঁটিকে এ ভাবে সুরমার কাছে আর রাখা চলে না। পুঁটির বিষন্ন ম্লান মুখ খানি ও করুণ চোখ দুইটির দিকে চাহিতেই সে ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু

এই স্নেহ-বন্ধনহীনা হতভাগিনী বলিকাকে সে কোথায় কার কাছে এখন বিদায় করিয়া দেয় !

পূর্ণেন্দুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সুলোচনা আবার বলিলেন, "মেয়েটি নিতান্ত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে, আমার তো মনে হয়, এই বয়সের মেয়েরা বিধবা হ'লে তা'দের আবার পাত্রস্থ করাই ভাল, নইলে তা'দের অনেক লাঞ্ছনা হয়। আমি জানি বাবা, তুমি হিন্দুর মেয়ের ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা ব'লবে, কিন্তু উপস্থিত সমাজে সে ব্রত পালনের বড় সুবিধাই বা কোথায় ?"

পূর্ণেন্দু কহিল, "কাকী-মা, আমি চুপ-চাপ কোরে থাকি ব'লে আপনারা আমায় মত খুব গোঁড়া ব'লেই জানেন, কিন্তু ঠিক্ তা নয় ; বাল-বিধবার বিবাহ হওয়া আমি দোষের মনে করি না। তবু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই ; আপনাদের ঘরে তো অনেক মেয়ে কুমারী অবস্থাতেই জীবন কাটিয়ে যান, তখন হিন্দুর ঘরের বিধবার পক্ষে সেই ভাবেই থাকাই বা অসম্ভব কেন ?"

এই সময়ে "বউ মা কোথা ! নির্ম্মলা-মা, আমার চা কই গো ?" —বলিতে বলিতে নিবারণ বাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, সুলোচনা কহিলেন, "ওরা সব একটু বেড়াতে গেছে, এল' বলে। একটু বোসো, বউ মা নিমকীর ময়দা মেখে রেখে গেছে, বলেছে—এখুনি এসে ভেজে দেবে, রাত্রে তো তুমি আর কিছু খাওনা !"

"ওঁ হরি ওঁ"—বলিয়া নিবারণ বাবু পালঙ্কের উপরে গিয়া বসিলেন, তখন সুলোচনা কহিলেন, "দেখ পূর্ণেন্দু, আমাদের মেয়েদের কুমারী ব্রত পালন এই জন্যে সহজ বলে মনে হয় যে, তা'দের ওপর বাঁধা-ধরা নিয়মের জুলুম নেই, আর নেই অশ্রদ্ধা,—অবজ্ঞার ভাব। সুতরাং হেসে খেলে তারা আনন্দে দিন কাটিয়ে

যায়। তাদের কুমারী জীবনের সঙ্গে, বাল-বিধবার জীবনের তুলনা হয় ক'ই বাবা? ব্রহ্মচর্য্য কথাটা খুব চমৎকার ও পবিত্র এ'তে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু দশ বার বছরের বালিকা এর মর্ম্ম বোঝে ক'ই? তা ছাড়া ঐ বালিকা যখন সহসা বিধবা হয়, তখন তার মাথার উপর ঐ কঠোর ব্রত পালনের ভার তুলে দিয়ে আত্মীয় স্বজনরা বেশ বিলাস-ব্যসনেই ডুবে থাকেন্, সুতরাং সে বালিকা বাইরে লোকাচারের বশীভূত হ'য়ে থানই পরুক্ আর নিরামিষই খাক্, মন টা তো বৈরাগ্য পূর্ণ হ'তে পায় না; এই যে পুঁটির অবস্থাই ভেবে দেখনা, বেচারী যেন সকলেরই গলগ্রহ, সংসারে এখন আহা ব'ল্‌তে 'ওর কেউ নেই, অথচ ওকে হতভাগী, পোড়াকপালী ব'ল্‌তে সংসার শুদ্ধ লোকই প্রস্তুত, এ অবস্থায় সংসার-স্রোতে কুটোর মতন ওকে ভেসে যেতে না দিয়ে যদি আবার বিবাহ দেওয়া যায়, সে মন্দ কি?"

নিবারণ বাবু কহিলেন, "নির্ম্মলা-মার কথা হ'চ্ছে বুঝি! আহা, বড় শান্ত-শিষ্ট মেয়ে, বড় চমৎকার সেবা-পরায়না, মেয়েটি লক্ষ্মী-প্র'তমা।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "কিন্তু কুমারী মেয়েরই বিবাহ হওয়া আজকাল কঠিন ব্যাপার, তখন বিধবা মেয়ের বিয়ে তো দূরের কথা।"

নিবারণ বাবু চিন্তিতভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, প্রফুল্ল তো খুব উৎসাহী যুবা, সে বিধবা বিবাহের খুব সমর্থন করে,—অবশ্য বিদ্যাসাগর মতে। সে নির্ম্মলাকে যথেষ্ট স্নেহও করে, সে কি নির্ম্মলাকে বিবাহ ক'র্‌তে পারে না? সে তো অবিবাহিত।"

পূর্ণেন্দু দৃঢ় স্বরে কহিল, "অসম্ভব, পুঁটির সঙ্গে প্রফুল্লর বিয়ে হ'তেই পারে না।"

সুলোচনা ব্যগ্র ভাবে কহিলেন, "হবার বাধা কি? প্রফুল্লকে জিজ্ঞেস কোরে দেখ্‌লেই তো হয়।"

পূর্ণেন্দু দৃঢ়স্বরে কহিল, "সে সম্মত হ'লেও আমি সম্মত হ'তে পারি না; কেন না, উপস্থিত আমিই পুঁটির অভিভাবক।"

পূর্ণেন্দুর স্বরের দৃঢ়তা ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে, সুলোচনা একটু বিস্মিত ও ক্ষুন্ন হইলেন, সুতরাং সে কথা আর উত্থাপন করিলেন না।

৩৩

কথাটা যখন খুবই জানাজানি হইয়া গেল, তখন লজ্জা ও সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া প্রফুল্লই পূর্ণেন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্ণ-দা, এ বিবাহে তোমার অসম্মতি কেন? তুমি রাজী হ'লে তো আর কোনো বাধা দেখ্‌ছি না, বিজয়-কাকার মত যে খুব উদার, তা তো আমাদের সকলেরই জানা আছে, তবে আর বাধার কারণ কি?"

পূর্ণেন্দু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "প্রফুল্ল মুখে উদারতার কথা আমরা অনেকে ব'লে থাক্‌লেও কাজের সময় বড় কেউ এগুতে চাই না, অবশ্য বিজয়-কাকার কথা ব'ল্‌ছি না; কিন্তু, তবু, তোমার সঙ্গে পুঁটির বিয়ে হ'তে দিতে পারি না।"

"কারণ, আমি কি সুপাত্র নই? ঐ বিধবা মেয়েকে বিবাহ করবার জন্য যে হীনতা স্বীকার,—তা আর বড় একটা কেউ ক'র্‌বে?"

পূর্ণেন্দু ধীরকণ্ঠে কহিল, "এই বার পথে এস, ঐ যে হীনতা-

স্বীকার কথাটা ব'ল্লে প্রফুল্ল, এতেই বোঝা যাচ্ছে পুঁটির প্রতি কতখানি কৃপা পরবশ হ'য়ে তা'কে তুমি স্ত্রী রূপে গ্রহণ ক'র্তে চাইছ, কিন্তু সহধর্ম্মিনীর পদ যাঁকে দেওয়া হবে, তাকে তো অতোখানি কৃপার চ'ক্ষে দেখ্লে চ'ল্বে না! চ'টে উঠো না প্রফুল্ল, বিবাহ ছেলে খেলা নয়, আজ উত্তেজনার মুখে বিধবা-বিবাহ ক'রে ব'স্লে; তার পর সমাজের নিষ্পীড়নে উত্যক্ত হ'[illegible] [illegible]বে, মেয়েটাকে নিতান্তই দয়া কোরে চরণে আশ্রয় দিয়েছিলে; নইলে এ যাত্রা তার কি শাস্তিই হোতো,—তখন তোমার স্ত্রীর জীবন বড় সুখের থাক্‌বে না; তা'র চাইতে তা'কে অতোটা দয়া এখন না দেখালেই ভাল।"

প্রফুল্ল ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে এতটা অপদার্থ মনে কোরো না পূর্ণেন্দু,—যাই হোক্, এ ছাড়া আর কিছু তোমার আপত্তির কারণ আছে কি?"

"নাঃ, তবে ঐ একটি মাত্র কারণই তার গুরুত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?"

মৃদু হাসিয়া প্রফুল্ল ক'হিল, "ও আপত্তি তোমার টিক্‌বে না, আমায় তুমি এতো খানি অবিশ্বাস কোরো না দাদা।"

"সেই ভাল"—বলিয়া পূর্ণেন্দু অন্য কাজে চলিয়া গেল, পরদিন প্রফুল্ল বাবার চিঠিতে জানিল, এই মাঘ মাসেই তিনি প্রফুল্লর বিবাহ দিবেন, পাত্রী দেখা ও কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়াছে, প্রফুল্ল যেন পত্র পাঠ অবিলম্বে দেশে রওনা হয়। পাত্রী—সুন্দরী, তা ছাড়া পাত্রীর পিতা যাচিয়া চারি সহস্র টাকায় কন্যাভরণ ও যৌতুক দিতে চাহিয়াছেন, ইত্যাদি। প্রফুল্ল বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল, এখন সে কি করে? সে বিধবা বিবাহ করিতেছে শুনিলে, পিতা-মাতা এখনই

ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিবেন, কিন্তু পিতা যখন কন্যা ও বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তখন তো মহা মুস্কিল। প্রফুল্ল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পুঁটিকে বিবাহ করিবার জন্য সে যতখানি উৎসাহী হইয়াছিল; পূর্ণেন্দুর সহিত কথা-বার্ত্তার পর, তার উৎসাহ ঠিক ততখানি পূর্ণ মাত্রায় প্রবল ছিল না, কিন্তু,—না,—সে কাপুরুষ নয়, এখন যদি সে পশ্চাদ্‌পদ হয়, পূর্ণ-দা তো আগেই হাসিবে, পুঁটিই বা কি মনে করিবে; পূর্ণ-দার সহিত কথা হইবার পর, কাল সে যে একখানি চিঠিতে পুঁটির কাছে কথার জাল বুনিয়া নিজের নিঃস্বার্থ সরল ভালবাসা নিবেদন করিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রফুল্ল চিঠিখানি লইয়া নিবারণ বাবুর কাছে গেল, তিনি তখন ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, প্রফুল্লর চিঠিখানি দুই তিনবার পড়িয়া তিনি কহিলেন, "এ রকম চিঠি তো পাবারই কথ, কিন্তু তুমি যখন প্রস্তুত হ'য়েছ, তখন এ রকম দশ-খানা চিঠি পেলেও তো আর দো-মনা হ'তে পার না, তোমার মনে যদি বল থাকে, নির্ম্মলা-মার প্রতি তোমার স্নেহানুরাগ যদি শুধু ক্ষণিকের মোহ না হয়, তা হলে অবিলম্বে এ বিবাহ সেরে ফেল; আর কোনো কথা নাই।"

সন্ধ্যার পর পূর্ণেন্দুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিবারণ বাবু কহিলেন, "প্রফুল্লর বাবার চিঠি দেখেছ পূর্ণেন্দু, তিনি তো প্রফুল্লর বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির কোরে লিখেছেন।"

পূর্ণেন্দু কহিল, "দেখেছি কাকাবাবু। বেশ মোটা টাকাটাও পাচ্ছেন।"

"কিন্তু প্রফুল্ল তো সে বিয়ে ক'রবে না, ও তো নির্ম্মলাকেই বিয়ে ক'রতে রাজী। আমার মনে হয়, একটু শীগ্‌গীর এ কাজটা সেরে ফেল্‌লেই ভাল, বিলম্বে বাধা আস্‌তে পারে।"

"এ রকম বিবাহে নানা দিক্ থেকে নানা বাধা আস্‌বেই, কিন্তু সেই সব বাধার সঙ্গে যদি ও যুঝ্‌তে না পারে, তা হোলে ওর এ বিবাহ করাই উচিত নয়। আমার মনে হয়, আরও কিছুদিন ধীর ভাবে অপেক্ষা ক'র্‌লে আমরা বেশ দেখ্‌তে পাব যে, প্রফুল্ল এ বিবাহ শেষ পর্য্যন্ত ক'র্‌তে চাইবে না। সুন্দরী বধূ, তিন-চার সহস্র টাকার যৌতুক, এ'টা বড় রকমের প্রলোভন নয় ?"

"কিন্তু, এ ভাবে ওর সম্বন্ধে বিচার ক'র্‌লে বড় অন্যায় হয় পূর্ণেন্দু, ও যে রকম সপ্রতিভ ও উৎসাহী, তাতে ওকে back করা চাই, নইলে মুষ্‌ড়ে প'ড়বে।"

পূর্ণেন্দু হাসিয়া কহিল, "আপনি নিজে যেমন সরল, সেই ভাবেই সকলের বিচার ক'র্‌তে চান্, আমি কিন্তু পুঁটির ভবিষ্যৎ ভেবেই ব'ল্‌ছি, এ বিবাহ না হওয়াই পুঁটির পক্ষে মঙ্গল।"

৩৪

বেদনাহতা কপোতীর ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া পুঁটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার বিবাহ লইয়া বাড়ীতে যে একটা গোলমাল চলিতেছে, তাহাতে সে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে ছিল, পূর্ণ দা যে এ বিবাহের ঘোর প্রতিবাদী, ইহাও তার অগোচর ছিল না। লজ্জায় এ কয়দিন সে আর পূর্ণেন্দুর সুমুখে বাহির হইতে পারিত না, তা'র ইচ্ছা হইত—মুখ ফুটিয়া এ বিবাহের প্রতিবাদ করে, কিন্তু তা'ও আবার পারিত না।

প্রফুল্লর ভালবাসা, তা'র অন্তরে বেশ একটু মাদকতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তা'র মত হতভাগিনীকে এতো খানি ভালবাসা, আত্মীয়

স্বজন, সমাজের উৎপীড়ন উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার উদ্যোগ—এ সবের জন্য প্রফুল্লর প্রতি তা'র হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তবু এ বিবাহে তার সম্মতি ছিল না। যে তা'কে ভালবাসিয়া এতো স্বার্থ ত্যাগ করিতেছে ; তাহাকে আত্মীয় স্বজনের লাঞ্ছনার হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়াই কি তার উচিত নয়? কিন্তু এ সব কথা মুখ ফুটিয়া কাহার কাছে বলে? ঠিক্ এই সময় সে বাল্য-সঙ্গিনী ভূতির এক খান চিঠি পাইল, সে লিখিতেছে,—

"কালামুখী, ছি—ছি, এ কি করিলে? একটা সংসার মজাইয়া সাধ মেটে নাই, আবার আমাদের সংসার মজাইবার চেষ্টা! তোমার মনে এত ছিল? মা তো শু'নয়া পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিছানা লইয়াছেন, বাবা পাগলের মত হইয়াছেন, আমরাও প্রায় সেইরূপ। বলি নদীতে কি কূয়ায় কি জল ছিল না? এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হ'ল? আর জন্মে কত পাপ ক'রেছিলে, এ জন্মে তাই তোমার এই শাস্তি, তার উপর আবার পাপের বোঝা বাড়িয়ে জন্ম-জন্মান্তরের ভাগ্যটাকে পর্য্যন্ত খুইয়ে ফেল্‌তে চাও! ছি—ছি, হিন্দুর মেয়ে তুমি, তোমার এই ব্যবহার! ভাল চাও ত এখনও শোনো, আমার ভাল মানুষ ভাইটির ঘাড়ে চেপো না, সংসারে অনেক দানা-দৈত্য আছে, তা'দের কাছে গিয়ে আশ্রয় নাও, নইলে তোমার কপালে অনেক দুর্গতি আছে—" ইত্যাদি। আরও অনেক কটূক্তিতে চিঠিখানি পূর্ণ ছিল, সেই চিঠি পাইয়াই পুঁটি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। হায়—হায়! তার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনাও ছিল! কেমন করিয়া, কাহাকে ডাকিয়া সে আজ বুঝাইয়া বলিবে যে, সে এ সবের মধ্যে নাই। প্রফুল্লর উপর তা'র রাগ হইতে লাগিল। সেই না যত অনর্থের মূল!

সুজাতা ঘরে আসিয়া পুঁটির অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, পুঁটিকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে নির্ম্মলা, কাঁদ্‌ছ কেন? অল্পকালের মধ্যেই সুজাতাকে পুঁটি ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, পুঁটি কাতরকণ্ঠে কহিল, "দিদি, তোমাদের পায়ে পড়ি, এ বিয়ে ভেঙে দাও, আমায় বাঁচাও।"

সুজাতা বলিল, "এর জন্য আবার কান্না কি? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে তো হ'তেই পারে না, জোর কোরে ত কেউ এ বিয়ে দিচ্ছে না!"

পুঁটি নিজের হৃদয়ের বোঝার ভারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুজাতাকে কিছু বলিতে পাইয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; উঠিয়া বসিয়া ভূতির চিঠিখানি সুজাতার হাতে দিল। সুজাতা পড়িয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল, "এ রকম চিঠি তাঁরা তো লিখিবেন-ই, তোমার বাবাকেও বুঝি প্রফুল্লর বাবা কি সব লিখেছেন। পুর্ণ-দা'কে যে চিঠি লিখেছেন; তাতেই সে কথা জানিয়েছেন। তার জন্যে অতো কান্না-কাটি কিসের? বোকা মেয়ে।"

নির্ম্মলা কহিল, "দিদি, এই তো তুমি বেশ আছ, আমায় তোমার কাছে রাখ্‌বে? আমি তোমার কাছে লেখা-পড়া শিখ্‌ব, কাকী-মা, কাকাবাবু আমায় খুব ভালবাসেন, বেশ থাক্‌ব।"

হায় চির-তৃষাতুর মানব হৃদয়; সে কেবলই স্নেহ-ভালবাসার জন্য লালায়িত।

সুজাতা কহিল, "বেশ তো, কিন্তু আমরা যে ব্রাহ্ম, তোমার বাবা যদি অমত না করেন, তা হোলে তোমায় নিয়ে যাব, তাঁ'কে তুমি চিঠি লিখে তাঁর মত জেনো!"

পুঁটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার এ মুখ

কাউকে দেখাতে লজ্জা হয়, লোকে আমায় গোড়াকপালী আর কালামুখী নাম দিয়েছে, সে তো মিথ্যে নয় দিদি! এ মুখ আমি কোথায় লুকুই!"

পুঁটির আক্ষেপ ধ্বনি সুজাতার অন্তঃস্তল স্পর্শ করিল। কি নিদারুণ দুঃখেই না পুঁটি এমন কথা বলিতেছে! নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতি মানুষের এক তিল মমতা নাই তা নয়, সেই ভাগ্য-বিড়ম্বতের প্রতিই মানুষ দ্বিগুণ, চতুর্গুণ আক্রোশ প্রকাশ করে, হায় রে সংসার! সান্ত্বনা বা সহানুভূতি—সব কিছুরই মধ্যে এই অত্যাচার ভাব প্রচ্ছন্ন।

৩৫

বিজয় পূর্ণেন্দুকে লিখিলেন,—

স্নেহাস্পদেষু,—

তোমার চিঠি পেয়ে আমার আজ আবার নূতন কোরে হুঁস হ'ল যে, সংসারের কাছে আমার সম্পূর্ণ ছুটি হয়নি, তা'র পায়ে যে দাস খৎ লিখে দিয়েছি; স্ত্রী-পুত্র দান কোরেও সে খৎ থেকে মুক্তি পাইনি। নইলে সত্যই বল্‌ছি, পুঁটির কথা স্মরণ ছিল না, অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যতের কিনারা যে একটা ক'র্‌তে হবে, তা'কে কিছু চিরদিন তোমার ঘাড়েই চাপিয়ে রাখা চ'ল্‌বে না, এইটে আমার মনে ছিল না, তার পর দুঃখী—যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে, সাধ ক'রে নিজের বোঝা বাড়িয়েছিলুম; সেও তোমার ঘাড়ে। সত্যই আমার এ রকম ক'রে থাকা উচিত হয়নি। আমি যামিনীরও একখানা চিঠি পেয়েছি, সে তা'র চার পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের ছত্রে ছত্রে অজস্র কটূক্তি আমার প্রতি প্রয়োগ করেছে; হাতের

কাছে পেলে বোধ হয় ন'খে কোরে আমায় চিরে ফেল্‌ত। সে বল্‌তে চায়, আমার নিজের দোষে আমার কন্যা বাল-বিধবা, আমার পাপেই আজ আমি স্ত্রী-পুত্র হীন, আর বিধবা মেয়ের বিবাহ দেবার উদ্যোগে পরজন্মটাও আমি এই রকম কোরে খোয়াতে যাচ্ছি। ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সত্যই কি প্রফুল্ল পুঁটিকে বিবাহ ক'র্‌তে চায়? পুঁটিরও যদি তা'তে মত থাকে, তা হোলে এতে আমার অমত নেই, কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এ বিবাহ হবে না, আর না হওয়াই ভাল। প্রফুল্লকে তুমি ভাল রকমই জান, সে যে এতখানি দুঃসাহসিকের কাজ ক'র্‌বে, তা আমার মনে হয় না, তা ছাড়া দেখ্‌তে হবে, অন্তরে কিসের পুঁজি নিয়ে সে এ রকম সমাজ বিরুদ্ধ গুরুতর কাজে হাত দিতে যাচ্ছে। তোমার কাছ থেকে এ সব বিষয়ে যখন কোনো চিঠি পাইনি, তখন মনে হ'চ্ছে, এ সব ফাঁকা কথা মাত্র। যাই হোক্‌, আমায় সব কথা খুলে লিখ্‌লে আমি না হয় আবার ঐ দিকে ফির্‌ব'। পুঁটি-মাকে নিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছ, আমার বেয়ান এখন কাশীতে রয়েছেন, তিনি সেখানে অনাথা বিধবাদের জন্যে একটি আশ্রম খুল্‌তে চান, আমি তাঁকে আজ লিখ্‌ব; ঐ আশ্রম তিনি সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে না খুলে, বরং স্বদেশে প্রতিষ্ঠা করুন, অনেক অসহায়া অভাগিনীর আশ্রয় হবে, পুঁটিকেও তিনি নিজের কাছে রাখুন। আমাদের সমাজ স্থানুর মত অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের উপর সে প্রত্যেক রকম হুকুম জারি ক'রেই নিশ্চিন্ত, হুকুম পালন কর্‌বার সুবিধা-অসুবিধা—স্থান, কাল, পাত্র —সে বিষয়ে আর যেন তার কিছু ভাব্‌বার নেই। অথচ, যে হুকুম পালন না ক'র্‌বে, তার প্রতি অভিসম্পাত সে যথেষ্ট বর্ষণ করে,

আর শাস্তিও দেয়, তা ছাড়া, যদিও অবাধ পাপ-স্রোত তা'র এদিকে ওদিকে ব'য়ে যাচ্ছে, সে দিকে তা'র নজর নেই, সে ব'ল্‌তে চায়, যদি কিছু অন্যায় কর, তা লোক-চক্ষুর অগোচরে কর, প্রকাশ্যে কিছু ক'রো না।—হায়রে সমাজ!

—আশা করি তোমরা সব ভালই আছ, আমিও বেশ আছি, গুরুদেব কাশীতেই আছেন, নিতাই আর আমি বম্বে চলেছি, জব্বলপুরে দু-সপ্তাহ ছিলাম, তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাবার জন্যে আবার এক সপ্তাহ থাক্‌তে হবে, এক রকম বেশ আছি, সংসারের বন্ধন-সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে এখন বেশ ঝাড়া হাত পা হ'য়ে যে দিকে দু-চোখ যায়, চ'লে চ'লেছি। এখন মনে হ'চ্ছে, এ রকম মুক্তিতে আনন্দ কিছু কম নেই, সতীশের জন্যে এখনও বুক্‌টা থেকে থেকে হায়-হায়, ক'রে ওঠে বটে, কিন্তু আবার মনে হয়, সে যে নেই—তা নয়, এই আকাশে—বাতাসেই, সে বুঝি মিলিয়ে আছে। তা ছাড়া, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ভগবানের ওপর যখন আমাদের হাত নেই, তাঁর কাজের ওপর যখন কথা কওয়া চলে না, তাঁর মারের যখন অভিযোগ কি প্রতিকার নেই, তখন চুপ করে মার খাওয়াই ভাল।—তিনি অচিন্ত্য, বোধাতীত, জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে কিছু বুঝ্‌তে চাইব, সে চাওয়াও বিড়ম্বনা। তখন ভবের হাটে, বেশী কিছু ভেবে চিন্তে উদ্বিগ্ন না হ'য়ে, দু-চোখ মেলে যা ভাল লাগে দেখে যাই, হাতের কাছে কিছু কর্‌বার কাজ থাকে ক'রে যাই, আর 'বলিহারি তোমার অন্ত মেলা ভার'—এই গান গেয়ে দিন কাটাই।"

পাগলের মতন কি তোমায় কতকগুলো লিখ্‌লাম, কিছু মনে কোরো না বাবা, তোমার বিজয়-কাকা চিরকেলেই পাগ্‌লা-ধাতের

লোক, তার মত লোককে সংসার থেকে বরখাস্ত কোরে ভগবান ভালই ক'রেছেন, ভবের হাটে সে এখন ঘুরে বেড়াক, সেই তা'র ভাল। আজ আসি তবে। পত্র পাঠ পুঁটির সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখো। আঃ—বিজয় কাকা।

পূর্ণেন্দু পত্র খানি দুই তিনবার সাগ্রহে পাঠ করিয়া যখন প্রফুল্লকে দিল, তখন গম্ভীর ভাবে কহিল, এই বিজয় কাকার চিঠি প্রফুল্ল, তোমার মতামত সম্বন্ধে তুমি কি ব'ল্তে চাও, পরিষ্কার ক'রে খুলে বল, তাঁকে আমি আজই জবাব লিখ্তে চাই।" প্রফুল্ল পিতার ও ভগিনীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া পর্য্যন্ত বড়ই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটির প্রতি যেটুকু টান তার পড়িয়াছিল, আর যেন তাহাতে জোর ছিল না, সে নীরবে চিঠিখানি পাঠ করিয়া নীরবেই পূর্ণেন্দুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। পূর্ণেন্দু আবার কহিল, "বেশ কোরে ভেবে চিন্তে জবাব দাও, তোমার বাবার চিঠিও তো পেয়েছ—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে প্রফুল্ল কহিল, "পূর্ণ-দা, আপনারা সবাই যখন আমায় অবিশ্বাসের চোখেই দেখ্ছেন, তখন আপনাদের দৃষ্টিই অক্ষুণ্ণ থাকুক, আমি আজই রাত্রে ক'ল্কাতা ফিরে যাচ্ছি।" পূর্ণেন্দু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এ তো রাগারাগির কথা বা কাজ নয়; তবু যখন এত বড় একটা গুরুতর কাজ ক'র্তে যাবে, তখন কিছু অগ্র পশ্চাৎ ভাব্তে হবে বৈ কি?"

প্রফুল্ল কহিল, "পূর্ণ-দা, আমি জানি, বরাবরই তুমি আমায় নিতান্ত কৃপার চ'ক্ষে দেখ, আমার সকল কাজ সকল চিন্তাই তোমার কাছে একটা ছ্যাব্লামি মাত্র, তখন তোমার সেই ধারণাই অক্ষুণ্ণ থাক্।"—এই বলিয়াই সে ত্বরিত পদে স্থান ত্যাগ করিল।

৩৬

গেরুয়া রঙের থানের উপর নামাবলী জড়াইয়া সৌদামিনী যখন গাড়ী হইতে নামিয়া পূর্ণেন্দুর সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সুজাতা ও সুলোচনা সে' জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। পূর্ণেন্দু কহিল, "কাকা-মা, ইনি আমাদের পুঁটির শ্বাশুড়ী, পুঁটিকে নিতে এসেছেন।"

সুলোচনা সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার করিয়া সৌদামিনীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "আসুন, ট্রেণে কিছু কষ্ট হয় নি ত?"

"কিছু না" বলিয়া সৌদামিনী সুলোচনার সহিত গিয়া কম্বলের আসনে বসিলেন, উভয়ের আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইল, সুরমা আসিয়া পায়ের ধূলা লইল, দুঃখী নগ্ন গাত্রে খেলা করিতেছিল, সে খেলা ফেলিয়া ধূলা মাখা গায়ে অদূরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলের সহিত নবাগতাকে দেখিতে লাগিল, তার সুঠাম-সুন্দর দেহের দিকে চাহিয়া সৌদামিনী কহিলেন, "এই সেই দুঃখীরাম? এস বাবা, কাছে এস।" হাত বাড়াইতেই দুঃখী ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সৌদামিনী সস্নেহে কোলে লইয়া দুঃখীর মাথার অযত্ন বিন্যস্ত কাক-পক্ষ কেশরাশি, বিস্তৃত শুভ্র ললাট হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "ঠিক যেন দেব-শিশু, চাঁদ নিঙড়ে বুঝি দেহখানি গড়েছে, ভগবানের বিচিত্র লীলা।"

সুলোচনা কহিলেন, "তবু বেচারীর ভবিষ্যৎ জীবন কি ভীষণ! সমাজে এর কোথাও স্থান নেই, মাথা তুলে বাছা কোনো দিন কারও কাছে দাঁড়াতে পারবে না, হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে বড় অনুদার।" সৌদামিনী কহিলেন, "এ রকম অবস্থায়, কোনো সমাজেই

কারও মাথা তুলে দাঁড়াবার জো থাকে না, সম্মুখে না ব'ল্‌লেও অন্তরালে তা'র জন্মাগত ইতিহাস নিয়ে সকলেই নাড়া-চাড়া ক'রে থাকে, শিক্ষা ও চরিত্রের গুণে যদি সে মানুষ হ'য়ে ওঠবার সুযোগ পায়, তা হোলে আবার সকল সমাজেই তা'র আদর হয়।"

সুলোচনা কহিলেন, "কিন্তু মানুষ হ'লেও হিন্দু সমাজ তো তা'কে আদর ক'র্‌বে না, সেখানে সে এক ঘরে, জাতিচ্যুত থাক্‌বেই।" সৌদামিনী কহিলেন, "রূপ, গুণ, কি বিদ্যা, নিজের আদর নিজেই কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নেয়। সমাজ ব'ল্‌তে—পাঁচ-জনেরই তো সমষ্টি, দু-পাঁচ জন সেই গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে আদর ক'র্‌লে আর পাঁচ-জনও ক'র্‌তে বাধ্য হয়।"

তারপর উভয়ে আরও অনেক কথা হইতে লাগিল, পূর্ণেন্দু আসিয়া কহিল, "কাকী-মা, উঠে স্নান করে স্নানাহ্নিক সেরে নিন্, কাল থেকে উপবাসী আছেন, কিছু সেবার ব্যবস্থা হ'ক্।" সৌদামিনী হাসিয়া কহিলেন, "এই তো বেলা ন'টা মাত্র, আমি তিনটার সময় হবিষ্য কবি, এখন তার কোনো তাড়া নেই।"

পূর্ণেন্দু চলিয়া গেল, সুজাতাকে সৌদামিনী কহিলেন, "যাও মা লক্ষ্মী, বৌ-মাকে ডেকে আন একবার দেখি, কত বৎসর দেখি নি।" সুজাতা চলিয়া গেল, সৌদামিনী কহিলেন, "আপনিও বড় শোক পেয়েছেন দেখ্‌ছি, এ জগতে তা'র হাত থেকে কারও অব্যাহতি নেই বোন্।"

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সুলোচনা কহিলেন, "আপনি কিন্তু খুব কাজ ক'র্‌ছেন, আপনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'র্‌ছেন তা'তে দেশের বড় উপকার হবে; আমাদের বড় ভাগ্য, তাই আপনাকে দেখ্‌তে পেলুম।"

"সে'টা উভয়তঃই দিদি, কাশীতেই এ আশ্রম খুল্‌ব ভেবেছিলুম, বেয়াইএর চিঠি প'ড়ে, আমার হুঁস হ'লো, দেশেই খোলা মঙ্গল।"

"কিন্তু বাধাও খুব বেশী। আপনাদের সমাজ নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য ক'র্‌বে না"

"তা তো নয়ই, বিশেষ পল্লীগ্রাম কি না, গাঁয়ে তো বাড়ী আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত হুলুস্থূল প'ড়ে গেছে, পুরুত ঠাকুর থেকে, ঠাকুর ম'শাই, আর গাঁয়ের ইতর ভদ্দর সবাই এসে মানা ক'র্‌ছে যে মা, অন্য কোনো সৎকাজ কর, হিন্দুর বিধবাদের স্কুল ক'রে পড়িয়ে তা'দের আর পরকাল ঝর্ঝরে কোরোনা, তা আমি কা'রও মানা শুন্‌ছি না, বাড়ী তৈয়ার শেষ হ'লো, তিনটি অনাথ বিধবা পেয়েওছি, কাগজে ঐ রকম বিধবার জন্যে বিজ্ঞাপনও দিয়েছি।" এই সময় সুজাতা ফিরিয়া আসিতেই, সৌদামিনী কহিলেন, "এই রকম মা লক্ষ্মীরা যদি আমার আশ্রমে পড়া শোনা শেখাতে কিছু সাহায্য করেন্ তা হ'লে বড় ভাল হয়।"

সুজাতা আনন্দে কহিল, "খুব খুসী হয়ে ক'র্‌ব, আমরা তো শীগ্‌গীরই ক'ল্‌কাতায় ফির্‌ছি, ফিরেই আপনার ওখানে যাব।"

সুলোচনা কহিলেন, "কি কি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন?"

"করিনি, ক'র্‌তে হ'বে। লেখাপড়া, সেলাই, তা ছাড়া পাঁচ রকম হাতের কাজ শিখে, যা'তে তা'রা স্বচ্ছন্দে নিজেদের ভরণ পোষণ ক'র্‌তে পারে, সেই সব শিক্ষা দেওয়া হবে। মনে তো অনেক করেছি দিদি, এখন সবি ভগবানের হাত।" এই সদাশয়া রমণীর মহৎপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া সুলোচনা সম্ভ্রমের সহিত কহিলেন, "আশ্চর্য্য আপনার কল্পনা, আপনারা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, ঘরের কোনে চিরকাল বউ সেজে বাস করেছেন, সে রকম লেখা পড়াও

শেখেন নি, সংস্কারও আপনাদের চিরবদ্ধ, তবু আপনার মাথায় এমন চমৎকার একটি কল্পনা এসেছে, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার আশ্রম আপনার পুণ্যে নিশ্চয়ই সফলতা-পূর্ণ হবে।"

সুজাতা কহিল, "লেখা পড়া শিখেই, আর পর্দ্দানশীন না থাক্‌লেই যে খুব উন্নতি ক'র্‌তে পারা যায়, তার আর মানে কি আছে মা? আমরা তো সব লেখাপড়া শিখে, খালি এক স্কুলেইমাষ্টারী কর্‌তে শিখেছি, আর আমাদের দ্বারা কোনো কাজ হয় না। পাঁচ রকম হাতের কাজ একত্র ক'রে স্থানে স্থানে যদি আমরা একটা দোকান চালাতে পারি, তা হোলে কত অনাথার জীবীকার উপায় হয়।"

"আপনার আশ্রমে ঐ রকম একটা বিভাগ রাখ্‌বেন?" সৌদামিনী হাসিয়া কহিলেন, "মা আমার বড় বুদ্ধিমতী, তোমাদের মতন মেয়ে না হ'লে আশ্রম চ'ল্‌বে কেন? তোমরা যে সার্থক লেখাপড়া শিখেছ; আজ তার কাজ দেখাতে হবে।"

শুনিতে শুনিতে সুলোচনার মস্তক শ্রদ্ধায় ও সম্মানে ভরিয়া উঠিতেছিল, তিনি কহিলেন, "আমার মেয়েও সব কাজে বড় উৎসাহী, ওকে আপনি অনেক কাজে পাবেন, কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই অনেক টাকা ব্যয় হবে।",

"তা হবে বৈকি, আমি বার্ষিক তিন হাজার টাকা আয়ের একটা তালুক এর জন্যে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি, তা ছাড়া হাজার টাকা, বাড়ীর জন্যে আমি দান ক'রেছি। বাড়ীর সঙ্গে পাঁচ বিঘা জায়গা আছে, সে'টাকে বাগান ক'রতে হবে, আর সেই বাগানের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী ক'রে, সে অর্থও আশ্রমের কাজে আসবে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিলেন, "এ শুধু আমার নিজের কল্পনা নয় বোন্, আমার শচীন বয়সে বালক হ'লেও, সে মাঝে মাঝে

ব'লত, মা, এ দেশের বিধবা আর অনাথা মেয়েদের জন্যে এই রকম একটা আশ্রম ক'র্‌তে হয়।" তখন তা'র কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু আজ তার সেই কল্পনা আমার বুকে যেন তা'র অনুরোধের মতন জেগে উঠেছে,এখন তা'কে আকার দিতে পার্‌লে,তবে আমার নিষ্কৃতি। আশ্রমের তাই সাধ কোরে নাম দিয়েছি **শচীন্দ্র-আশ্রম,** এখন শচীর বৌ গিয়ে সে আশ্রম রক্ষা করুক।"

সুজাতা কহিল, "নির্ম্মলা মাটিতে প'ড়ে আছে, টেনে তুল্‌তে গেলুম,উঠ্‌লো না,বলে,এ পোড়া-মুখ কাকে আমি দেখাই কি ক'রে?"

সৌদামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কালামুখ তা'র নয় মা, আমারই। যা'র জন্যে তার সঙ্গে সম্পর্ক, তা তো আর নেই, তবু ঐ বালিকাকে সমস্ত জীবন আমারই বন্ধনের মধ্যে কাটাতে হবে, তা সে বন্ধনে যাতনাই থাক্ আর আনন্দই থাক্। যে প্রস্তাব আমি শুনেছিলাম, মনটা তেতো হ'য়ে উঠ্‌লেও ভাবলুম, তা'তে ক্ষতিই বা কি, যে বিয়ে ওর হয়েছিল, সে তো বিয়েই নয়। আচ্ছা, চলতো মা, কোথা আছে বউ মা, নিজেই একবার যাই!"

সুজাতার সহিত সৌদামিনী ধীর পদে পুঁটির গৃহে প্রবেশ করিলেন, পুঁটির দিকে চাহিয়াই অজ্ঞাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন,— এই সেই পুঁটি? আলু-থালু বেশ, শ্যামবর্ণের কৃশকায় বালিকার পরিবর্ত্তে তরঙ্গী যুবতী; এত দুঃখ এত যাতনার মধ্যেও সে' সুকুমার দেহে যৌবনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, রাশিকৃত রুক্ষ কেশ অযত্নে মাটিতে লুটাইতেছে, তা'রই মধ্যে পুঁটির ক্রন্দনারক্ত মুখ খানি সৌদামিনীর বক্ষে মূর্ত্তিমতী বিষাদের ন্যায় প্রতিভাত হইল। পুঁটি তাহাদের আগমন জানিতে পারে নাই, সুজাতা কহিল, "নির্ম্মলা, ওঠো,তোমার শাশুড়ী তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন,তাঁকে প্রণাম কর।"

পুঁটি ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া সৌদামিনীর দুই পায়ে মুখ লুকাইল, সৌদামিনী ব্যস্ত ভাবে কহিলেন, "এ পাগ্‌লী আবার এ কি করে? ছেড়ে দে মা, ছেড়ে দে।"

পুঁটি পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়াই কহিল, "বলুন, আমায় মাপ ক'র্‌লেন, বলুন, আমায় আর কাছ ছাড়া ক'র্‌বেন না?"

সৌদামিনী বসিয়া পড়িয়া পুঁটিকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "তোকে নেবার জন্তেই তো এসেছি মা, আর মাপ তোকে কি ক'র্‌ব মা, নিজেদের দোষের ভারেই পিট আমাদের নুয়ে প'ড়েছে, অথচ তোদের একটু-আধটু ভুল ত্রুটি মাপ না কোরে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়ে সেই বোঝার ভার দিগুণ বেড়ে চলেছে, এখন ওঠ্ মা, তোকে আর দুঃখীকে আমি নিতে এসেছি, এখানে আমার দুদিনও থাক্‌বার অবকাশ নেই, সেখানে নূতন আশ্রম "প্রতিষ্ঠা" হ'চ্ছে, তুই গিয়ে আমার ডান হাত হ'বি চল্।"

গলায় কাপড় দিয়া সমস্ত অন্তর খানি ভক্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিয়া পুঁটি আর একবার সৌদামিনীর চরণে প্রণাম করিল, এই সময় নিবারণ বাবু দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিলেন, "নির্ম্মলা-মা, তোমার শ্বাশুড়ীকে একবার আমায় দেখ্‌তে দাও, তাঁর কথা যা সব শুনলুম, তাতে যে কি আনন্দ হ'লো, তা আর কি বল্‌ব। শোকের আগুনে দগ্ধ হ'য়ে গিয়ে, তাঁর সমস্ত অন্তরটি খাঁটি সোণা হ'য়ে গেছে, সেই সোণার দিব্য জ্যোতিতে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ আলোকিত হ'য়ে উঠুক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।"

আসুন সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, সরল প্রাণ নিবারণ বাবুর এ পবিত্র প্রার্থনা-বাণী, আমরাও সমস্ত অন্তরের সহিত অভিনন্দন করি :

সমাপ্ত